بسم الله الرحمن الرحيم

হিজরত ও জিহাদ

শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহারী

অনুবাদ : অধ্যাপক সিরাজুল হক

সাজেদানে তাবলীগাতে ইসলামী
২৯৭

মূল :

هجرت وجهاد
شهید مرتضی مطهری.

অনুবাদ :
হিজরত ও জিহাদ
অধ্যাপক সিরাজুল হক

প্রথম বাংলা সংস্করণ :
হিজরী : ১৪০৮ , বাংলা : ১৩৯৪, ইংরেজী : ১৯৮৭।

প্রকাশনায় :
বাংলা বিভাগ,
সাজেমানে তাবলীগাতে ইসলামী,
পোঃ বক্স নং- ১৪১৫৫/১৩১৩,
তেহরান, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান।

মুদ্রণে :
সেপহর, তেহরান,
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান।
297

প্রকাশকের কথা

আলোচ্য পুস্তকটি শহীদ আয়াতুল্লাহ মুরতাজা মুতাহারীর তিনটি ভাষনের সমষ্টি। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের প্রায় তিন বছর পূর্বে (১৯৭৫ ইং) তেহরানের নারমাক জামে মসজিদে তিনি 'হিজরত ও জিহাদ' শীর্ষক এই ভাষন গুলো প্রদান করেন। 'টেপ' এর মাধ্যমে সংগৃহীত তার এ ভাষনগুলো পরবর্তী সময়ে পুস্তক আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। এ পর্যন্ত এর ফারসী, আরবী ও উর্দু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনদের কথা চিন্তা করে এর বাংলা সংস্করণও প্রকাশ করা হলো।

মরহুম শহীদ মুরতাজা মুতাহারী তাঁর এ সব ভাষনে হিজরত এবং জিহাদের বাহ্যিক এবং অন্তর্নিহিত মর্মার্থকে অত্যন্ত সহজ সরল এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে এই বিষয়টি ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, যদি 'হিজরত ও জিহাদ'কে উপরোক্ত দু'টি অর্থের কোন অর্থেই গ্রহন করা হয় অথবা যদি কোন কারনে একটি অর্থ পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে ইসলামের সরল ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটবেবৈকি।

উদাহরণ স্বরূপ হিজরতকে যদি শুধু গুনাহ সমূহ পরিত্যাগ করার অর্থে এবং জিহাদকে যদি শুধু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অর্থেই গ্রহন করা হয় এবং প্রয়োজনের তাগিদে স্থান তথা ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন ও ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ভুলে যাওয়া হয়, তাহলে ইসলামের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটবে এবং ইসলামী অনুশাসন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হবেনা। বরং কর্তব্য হলো হিজরত ও জিহাদের উভয় অর্থই গ্রহন করা।

এ সব ভাষন ঠিক তখনই প্রদত্ত হয়েছিল, যখন দেশে

স্বৈরাচারী শাহের জুলুম নির্যাতন তুংগে উঠেছিল। আর এমনি সময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে এ রূপ ভাষন দান শহীদ মুতাহারীর স্বাধীন চিন্তা ও বীরোচিত মনোভাবেরই পরিচায়ক। আল্লাহতায়ালা তার এ মহান শ্রমকে সার্থক করে তুলুন এবং সংগে সংগে আমাদের এ অকিঞ্চিৎকর উদ্যোগকেও গ্রহন করুন—এই প্রার্থনাই করছি।

তারিখ, তেহরান : সাজেদানে তাবলীগাতে ইসলামী
৩০শে রবি উস সানী, ১৪০৮ হিঃ (ইসলামী প্রচার সংস্থা)
২২শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭ ইং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ,
১লা দে, ১৩৬৬ হিঃ শামসী তেহরান, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله وحبيبه وصفيه و حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد(ص) وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً»

'আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশে হিজরতের জন্যে নিজ গৃহ থেকে বের হয় অতঃপর এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার প্রতিফল ও প্রতিদান আল্লাহতায়ালাই প্রদান করবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল।' (সূরা নিসা : ১০০)

সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, পবিত্র ইসলামের ভিত্তি দু'টি মৌলিক স্তম্ভের উপর মজবুত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর একটি হচ্ছে 'হিজরত' ও অন্যটি 'জিহাদ'। কুরআন মজিদ এ দু'টি বিষয়কে অতীব গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছে এবং মুজাহিদ ও মুহাজিরদের প্রতি বিপুল সম্মানও দেখিয়েছে।

হিজরতের অর্থ হচ্ছে ঈমান রক্ষার তাগিদে নিজের ঘর-বাড়ী ও জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া। অর্থাৎ বাড়ী-ঘর সমাজ-সংসার সব কিছু ত্যাগ করে কোথাও দূরে তথা এমন কোন ভূখন্ডে চলে যাওয়া যেখানে ইসলামী পরিবেশ ও ইসলামী অনুশাসন রয়েছে। মোটকথা, এমন কোন ভূখন্ডে চলে যাওয়া যেখানে ইসলামী

বিধান ও অনুশাসন মুতাবিক জীবন-যাপন করা সম্ভব। কুরআন মজিদের অনেক স্থানেই আমরা 'হিজরত' এবং 'জিহাদ' এ দু'টি শব্দ যুগপৎ ভাবে দেখতে পাবো।

والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا

'যে সব লোক ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে 'হিজরত' ও 'জিহাদ' করেছে এবং যে সব লোক আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারাই হচ্ছে সত্যিকার মুমিন।' (সূরা আনফাল : ৭৪)

ইসলামের প্রথমিক যুগে মুসলমানগণ দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন। তাদের এক দলকে বলা হতো 'মুহাজির' এবং অন্য দলকে বলা হতো 'আনসার'। সে সব মুসলমান ও মুমিনকেই 'মুহাজির বলা হতো যারা তাদের ঈমান রক্ষার তাগিদে ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে মদীনায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ইসলামে জিহাদের মতো হিজরতও একটি অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী বিধান। এ চিরস্থায়ী বিধানটির কোন ব্যত্যয় ও পরিবর্তন নেই। অর্থাৎ সব সময়ের জন্যেই এ সম্ভবনা বিদ্যমান রয়েছে যে, যে কোন সময় এমন কোন অবস্থা ও পরিস্থিতি এসে যেতে পারে যখন মুসলমানদেরকে দেশত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হতে পারে।

জিহাদের মতো হিজরতের ব্যাপারে একটি ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে। সুতরাং এর নিরসন হওয়া প্রয়োজন। আর এজন্যে 'হিজরত' এবং 'জিহাদ' এ দুটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আবশ্যক।

হিজরতের এবং অনুরূপ ভাবে জিহাদেরও দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়ে থাকে। আর তা হচ্ছে এই : হিজরত মানে পাপ কাজ থেকে হিজরত এবং দূরত্ব অবলম্বন। المهاجر من هجر السيئات : অর্থাৎ মুহাজির তাকেই বলা যেতে পারে যে গুনাহ সমূহ ত্যাগ করেছে এবং তা থেকে দূরত্ব অবলম্বন করেছে। এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই যে,

হিজরতের এব্যাখ্যা সঠিক কিনা? উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তি পাপ-পংকিলতায় নিমজ্জিত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে তা থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে তাহলে সেওতো এক ধরণের মুহাজির। কেননা, সে গুনাহ সমূহ ছেড়ে দিয়েছে—তা থেকে দূরত্ব অবলম্বন করেছে। হিজরতের এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হলে পৃথিবীর সকল তোবা-অবলম্বনকারী তথা পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তিকেই মুহাজির হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ, তারা তো যাবতীয় পাপ কর্ম পরিত্যাগ করেছে—সে গুলো থেকে হিজরত করেছে। এই প্রসংগে আমরা 'ফজল ইবনে আইয়াজ' এবং 'বাশার হাফী' এর মতো লোকদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারি।

ফজল ইবনে আইয়াজ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে প্রাথমিক জীবনে একজন নামকরা চোর ও ডাকাত ছিল। অতঃপরতার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলো। সকল প্রকার পাপ ও জুলুম নির্যাতন পরিত্যাগ করে দ্বীনের পথে প্রত্যাবর্তন করলো। এরপর থেকে সে বুজুর্গ লোকদের মধ্যে গণ্য হতে লাগলো। শুধু নিজেই তাকওয়ার অনুসারী হলো না, বরং অন্যদেরকেও ইসলামের দিকে প্রতিনিয়ত আহ্বান করতে লাগলো। তাদেরকে একত্রিত করে ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলো। অথচ এর পূর্বে সে ছিলো একজন দুর্ধর্ষ ও ভয়ংকর ডাকাত। লোকেরা তাঁর ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত ও আতংকিত থাকতো।

এক দিনের কথা। চুরি করার উদ্দেশ্যে সে এক দিন রাতের বেলা জনৈক ব্যক্তির বাড়ীর প্রাচীরের উপরে উঠলো। সে তখনো প্রাচীর থেকে নেমে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে নি। বাড়ীর মালিক, যিনি একজন আবেদ বা তাপস ব্যক্তি ছিলেন, 'তাহাজ্জুদ-নামাজ' ও দোয়া পাঠানে কুরআন শরীফ পাঠ করছিলেন। কুরআন পাঠের মর্মস্পর্শী আওয়াজ তার কানে ভেসে এলো। ঘটনাক্রমে গৃহস্বামী তখন কুরআনের এই

আয়াতটি পাঠ করছিলেন :

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

'এখনো কি ঈমানদারদের জন্যে সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে ভীত বিহ্বল ও বিগলিত হয়ে যায়? (সূরা আল হাদীদ: ১৬)অর্থাৎ পাষাণ হৃদয় আর কতদিন? এখনো কি খোদার দিকে প্রত্যাবর্তনের সময় হয়নি? ওহে, এখনো কি পাপ কর্ম সমূহ পরিত্যাগ করে মুক্তি অর্জনের সময় আসেনি?

যখন তার কর্ণকুহরে পবিত্র কুরআনের এই মর্মস্পর্শী আওয়াজ পৌঁছালো, তখন যেন তার উপর ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ হচ্ছিল। সে মনে করলো, এ আয়াত যেন তাকে সম্বোধন করেই পাঠ করা হচ্ছে।

এরপর সে প্রাচীরের উপর বসা অবস্থায়ই বলতে লাগলো : হে, আল্লাহ! কেন নয়? কেন না? হাঁ, আমার অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছে, আপনার দিকে প্রত্যাবর্তনের সময় এসে গেছে। এই বলে সে সহসা প্রাচীরের উপর থেকে নীচে নামলো। চুরি ডাকাতি, মদ্যপান, জুয়া-খেলা প্রভৃতি গর্হিত কর্ম ও আচরণ থেকে তোবা করলো। যাবতীয় পাপ-পংকিলতা থেকে নিজেকে পবিত্র করলো। নিজের সাধ্যমতো মানুষের হক বা পাওনা সমূহ প্রত্যর্পণ করলো। আল্লাহর অধিকার সমূহও আদায় করলো। মোটকথা, অতীতে কৃত সমস্ত পাপের ক্ষতিপূরণ বা প্রায়শ্চিত্ত করলো। এ হিসেবে এ ব্যক্তিও একজন মুহাজির'। কেননা, সেওতো সমুদয় পাপ কর্ম পরিত্যাগ করেছে।

হযরত ইমাম মূসা কাজেমের সময়ে 'বাশার হাফী' নামে বাগদাদে এক ব্যক্তি ছিলো। লোকেরা তাকে বাশার বলে ডাকতো। সে বাগদাদের ধনাঢ্য ও সম্পদশালী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। একদিন হযরত মূসা কাজেম (আঃ) তার বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। ঘটনা এমে ঐ সময়ে একটি দাসী আবর্জনা ফেলার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে

বেরিয়ে এসেছিল। এ সময় ঘর থেকে গান বাদ্যের আওয়াজ বেরিয়ে আসছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন মদ্যপায়ী ও নর্তক নর্তকীদের শোরগোল। ইমাম রুষ্টাশ্বিত কণ্ঠে দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কার বাড়ী? এটা কি কোন ক্রীতদাসের ঘর না কোন স্বাধীন লোকের?' দাসী আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো :'কেন আপনি কি জানেন না? এটা হচ্ছে সে বিখ্যাত বাশারের বাড়ী যিনি বাগদাদের ধনী ও সম্পদশালী লোকদের অন্যতম। কি করে তিনি একজন ক্রীতদাস হতে পারেন? তিনি তো একজন স্বাধীন লোক।'

এরপর ইমাম বললেন :'আজাদ আছে বলেই তো তার ঘর থেকে শোরগোল বেরিয়ে আসছে। যদি সে পরাধীন বা ক্রীতদাস হতো তাহলে এমনটি হতে পারতো না।'এই কথা গুলো বলে ইমাম সম্মুখের দিকে চলে গেলেন।

এদিকে বাশার দাসীর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন। যখন সে বিলম্বে ঘরে ফিরলো, তখন তাকে এ বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো। দাসী জবাব দিলো : এক ব্যক্তি আমাদের ঘরের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মধ্যে খোদাভীরু ও পুণ্যবান লোকদের চিহ্ন সমূহ প্রতিভাত হচ্ছিলো। তাঁর কপালে ইবাদাত-বন্দেগীর আলামত জ্বলজ্বল করছিলো। তিনি যখন আমাকে দেখলেন, জিজ্ঞাসা করলেন : এই ঘরের মালিক আজাদ না ক্রীতদাস? আমি জবাব দিলাম :হাঁ, আজাদ।

বাশার জিজ্ঞাসা করলেন : 'এরপর তিনি কি বললেন?'দাসী উত্তর দিলো :'তিনি বললেন :হাঁ, আজাদ আছে বলেই তো এমনটি হচ্ছে। আর যদি সে স্বাধীন না হতো তাহলে কখনো এমনটি হতে পারতো না।'

ইমামের এসব কথা বাশারের অন্তরে গভীর রেখাপাত করলো। সে দাসীকে জিজ্ঞাসা করলো : সে বুজুর্গ ব্যক্তি কোন দিকে গেলেন? দাসী বললো : এইতো এই দিকে -।'একথা শুনতেই বাশার সে দিকে

দৌড়ে গেলো। জুতা পরারও অবকাশ পেলনা। নগ্ন পদে সে তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। আর মনে মনে বলতে লাগলো : এ ব্যক্তি ইমাম মূসা কাজেম ব্যতীত আর কেউ হতে পারেন না।' অবশেষে সে ইমাম কে খুঁজে পেতে সক্ষম হলো। ইমামকে দেখা মাত্র সে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লো এবং বললো : হে, আমার মাওলা, আমি চাই এখন থেকে ক্রীতদাসের ন্যায় জীবন যাপন করবো, আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ রূপে পরিগণিত হবো। এই স্বাধীনতা মূলতঃ প্রবৃত্তি পূজার স্বাধীনতা এবং মনুষ্যত্বের গোলামী। এ রূপ স্বাধীনতা আমার কাম্য নয়। যার মধ্যে রয়েছে ভোগ লালসা, অর্থ সম্পদ, সম্মান সম্ভ্রম ও গৌরবের আজাদী এবং জ্ঞান বুদ্ধি ও ফিতরাতের দাসত্ব তা আমি চাইনা। আমার ইচ্ছা এখন থেকে আমি আল্লাহর প্রকৃত বান্দাহ হয়ে জীবন যাপন করবো। এবং খোদাদ্রোহিতার বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করবো। অতঃপর সে ইমামের হাতে তোবা করলো। যত রকমের পাপ-পংকিলতা রয়েছে, রয়েছে পাপের উপকরণাদি সে সবের বন্ধন থেকে নিজেকে ছিন্ন ও মুক্ত করে আল্লাহর আনুগত্যের উপর নিজেকে সোপর্দ করে দিলো। কাজেই বলা যেতে পারে যে, এই ব্যক্তিও 'মুহাজির'। কেননা, যে ব্যক্তি গুণা সমূহ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছে, সেইতো মুহাজির-- المهاجر من هجر السيئات।

জিহাদ প্রসংগেও এধরণের ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। المجاهد من جاهد نفسه অর্থাৎ 'মুজাহিদ' তাকেই বলা যেতে পারে যে তার প্রবৃত্তির সংগে জিহাদ করেছে।' ১ সেই ব্যক্তিই মুজাহিদ যে তার النفس الامارة 'নফসে আম্মারা' যা সকল মানুষের মধ্যে রয়েছে, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে-সংগ্রাম করছে নিজের প্রবৃত্তির কামনা বাসনা ও ভোগ লালসার বিরুদ্ধে।

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আঃ) বলেছেন : أشجع الناس من غلب هواه 'সে ব্যক্তিই হচ্ছে বীর পুরুষ যে তার প্রবৃত্তির

কামনা বাসনার উপর জয়ী হতে পেরেছে।' [২]

এক দিনের ঘটনা। নবী করিম(সঃ) মদীনার একটি সড়ক দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন যে, কতিপয় মুসলিম যুবক একটি ভারী পাথর উত্তোলন করে তাদের শক্তি পরীক্ষা করছে। নবী করিম(সঃ) একে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন এবং সহসা সেখানে দাড়ালেন। তিনি বললেন : 'যদি তোমরা চাও তাহলে আমি এব্যাপারে একটি মীমাংসা করে দিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী।' সবাই তাঁর এ প্রস্তাবে সম্মত হলো এবং বললো : 'হাঁ, আপনিই মীমাংসা করে দিন। আপনার চেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ ও ইনসাফগার আর কে আছে?' রাসুল(সঃ) বললেন : 'এটা কোন জরুরী বিষয় নয় যে, তোমরা পাথর উত্তোলন করবে, অতঃপর আমি মীমাংসা করে দেবো যে তোমাদের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী। বরং তোমাদের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে কোন পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে-অতঃপর তার প্রবৃত্তি উক্ত পাপ কাজ সম্পাদন করার জন্যে তাকে বাধ্যও করে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে স্বীয় প্রবৃত্তির কামনা বাসনার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করে তা থেকে বিরত থাকে।

অর্থাৎ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা যাকে কোন পাপ কর্মে প্রবৃত্ত করতে পারে না— পারেনা নত ও বাধ্য করতে সেই সব চেয়ে শক্তিশালী। প্রবৃত্তির তাড়না ও কামনা-বাসনা থেকে যে নিজেকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে পেরেছে সেই সত্যিকারের বীর পুরুষ।

'পুরিয়াওয়ালী' একজন পৃথিবী বিখ্যাত বীর ছিলেন। সমকালীন অন্যান্য বীর পুরুষগণও তার শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। তার ব্যাপারে কথিত আছে যে, এক সময় তিনি কোন এক দেশের একজন বীরের সংগে মোকাবিলা করার জন্যে গিয়েছিলেন। সে দিন ছিল জুমার রাত। তিনি দেখতে পেলেন যে, একজন বৃদ্ধা মহিলা

লোকদের মধ্যে হালুয়া বিতরণ করছেন। বৃদ্ধা জানতো না যে প্রখ্যাত বীর 'পুরিয়া ওয়ালি'ও ওখানে উপস্থিত আছেন। বৃদ্ধা মহিলা হালুয়া বিতরণ করছিলেন এবং তার ছেলের জন্যে দোয়া প্রার্থণা করছিলেন। মহিলা 'পুরিয়া ওয়ালীকে হালুয়া দান পূর্বক বললেন:'বাবা দোয়া করো যাতে আমার একটা আশা পূর্ণ হয়ে যায়।'তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার কি আশা জানতে পারি কি?'বৃদ্ধা জবাব দিলেন : 'আমার ছেলে এ দেশের একজন নামজাদা বীর। অন্য এক দেশের এক বীর পুরুষের সংগে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। আমি আমার এ ছেলের উপার্জনের উপরই জীবন যাপন করে আসছি। এমতাবস্থায় আমার ছেলে যদি তার নিকট হেরে যায়, তাহলে শুধু তার ইজ্জত সম্মানই ধূলায় লুণ্ঠিত হবেনা, বরং আমার জীবনও বিপন্ন হবে। আমার বাচার আর কোন উপায় থাকবে না। সুতরাং তার জন্যে দোয়া করো।' পুরিয়া বললেন :আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনার ছেলে যাতে জয়লাভ করে সে জন্যে আমি নিশ্চয়ই দোয়া করবো।'

তিনি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, পরবর্তী দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে তিনি কি ভূমিকা অবলম্বন করবেন? তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন:'যদি আমি তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী প্রমাণিত হই, তাহলে তাকে পরাস্ত করবো কি করবো না।'অবশেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন:'প্রকৃত প্রস্তাবে বীর পুরুষ তো সেই যে তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে।'

নির্ধারিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী তিনি ময়দানে গেলেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সংগে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন। তিনি দেখলেন, প্রকৃত-পক্ষেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী তার চেয়ে কম শক্তিশালী। ইচ্ছা করলে সহজেই তিনি তাকে কাবু করে ফেলতে পারেন। তা না করে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার সংগে শক্তি পরীক্ষায় মশগুল রইলেন। অতঃপর তিনি কিছুটা শৈথিল্য ও দুর্বলতা প্রদর্শন করলেন। আর এমবস্থায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী

তাকে ভূমিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চড়ে বসলো।

কথিত আছে যে, ঠিক এ সময়েই তিনি এটা অনুভব করলেন যে, আল্লাহতায়ালা তার অন্তর কে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তার নিকট মনে হচ্ছিল যে, তিনি সৃষ্টি লোকের সকল রহস্য স্বচোখে অবলোকন করছেন। এটা কেন হলো? কি করেই বা এমনটি সম্ভব হলো? আসলে তিনি ক্ষণিকের জন্যে হলেও আপন প্রবৃত্তির সংগে জিহাদ করেছেন। এর পর থেকেই তিনি বুজুর্গ ও পুণ্যবান লোকদের মধ্যে গণ্য হতে লাগলেন। এটা এ জন্যে যে, المجاهد من جاهد نفسه অর্থাৎ 'মুজাহিদ তাকেই বলা যেতে পারে যিনি নাফস' বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। অনুরূপ ভাবে أشجع الناس من غلب هواه অর্থাৎ 'বীর পুরুষ তাকেই বলা যেতে পারে যিনি তার প্রবৃত্তির কামনা বাসনার উপর জয়ী হতে পেরেছেন।' তার এ মর্যাদা এ জন্যে যে, তিনি এমন শক্তি ও বীরত্ব প্রদর্শন করতে পেরেছেন যা সকল প্রকার বীরত্ব ও শক্তির উর্ধে। [৩]

'আমর ইবনে আবদে উদে'র সংগে হযরত আলী (রাঃ) এর যুদ্ধের কাহিনীটি এর চেয়েও বড় চমকপ্রদ বিষয়। আমর এমন এক পরাক্রম শালী বীর ছিল যাকে 'ইয়ুল ইয়ুল' এর অশ্বারোহী বলা হতো। [৪]

সে হাজার লোককে একাই মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিল। পরিখার (খন্দক) যুদ্ধে মুসলমানগণ পরিখার এক প্রান্তে এবং শত্রুসৈন্য অপর প্রান্তে অবস্থান করছিল। শত্রুগণ পরিখা অতিক্রম করে মুসলমানদেরকে হামলা করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। অবশেষে 'আমর ইবনে আবদে উদ' কতিপয় লোক সহ কোন না কোন প্রকারে পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হলো। সে তার ঘোড়া হাকিয়ে ভীষণ ভাবে গর্জে উঠলো: 'আমার সংগে মুকাবিলা করার মতো কেউ আছে কি?' মুসলমানদের পূর্ব থেকেই তার

শক্তিমত্তা সম্বন্ধে ধারণা ছিল। সুতরাং কেউই তাকে প্রতিহত করতে সাহস পেলেন না। কেননা, তারা জানতেন, তার সংগে মুকাবিলা করতে গেলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

ঠিক এই মুহূর্তেই নবী করিম(সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন: তার সংগে মুকাবিলা করার জন্যে কে যাচ্ছে? 'বিশ-পচিশ বছরের একজন যুবক ব্যতীত আর কেউই জবাব দিলেন না। আর তিনি ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব। তিনি বললেন: 'হে, আল্লাহর রাসূল, আমি উপস্থিত আছি।' রাসূল(সঃ) বললেন: 'না, তুমি বসে থাকো।' আমর আবার গর্জে উঠলো: আমার সংগে লড়াই করার মতো কে আছে? এবারও হযরত আলী(আঃ) ব্যতীত আর কেউ দাড়ালেন না। কিন্তু নবী করিম(সঃ) এবারও তাকে বিরত রাখলেন এবং বললেন: 'হে, আলী এখন বসো।' এরপর তৃতীয় অথবা চতুর্থ বার যখন সে(আমর) মুকাবিলার আহ্বান জানালো, তখন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব(রাঃ) দাড়ালেন এবং অন্যান্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে অপারগতার আবেদন জানিয়ে বললেন: 'হে, আল্লাহর রাসূল, যদি কোন ব্যক্তি জবাব না দেয়, তাহলে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে এ ব্যাপারে ক্ষমা চাচ্ছে। কেননা, কেউই তার সংগে লড়াই করার ক্ষমতা রাখে না।'

অবশেষে হযরত আলী(আঃ)ই তার সংগে মুকাবিলা করার জন্যে ময়দানে গেলেন। অহংকারী আমরকে ধরাশায়ী করে তিনি তার বুকের উপর চড়ে বসলেন। দেহ থেকে তার শির বিচ্ছিন্ন করে দেবেন—ঠিক এই মুহূর্তেই আমর তার সংগে একটি অশোভন আচরণ করে। সে হযরত আলী (আঃ)এর মুখমন্ডলে থুথু নিক্ষেপ করলো। অতঃপর তিনি তার বুকের উপর থেকে উঠে দাড়ালেন। কিছুক্ষণ পর প্রস্তুতি নিয়ে আবারও তাকে ধরাশায়ী করলেন এবং তার বুকের উপর উঠে বসলেন।

আমর জিজ্ঞাসা করলো: কেনইবা উঠে গেলে এবং কেনইবা

পুনরায় হামলা করলে?' তিনি বললেনঃ 'তুমি যখন আমার মুখমন্ডলে থুথু নিক্ষেপ করেছিলে তখন আমার ভীষণ রাগ ও গোস্সা হয়েছিল। ঠিক সে অবস্থায় যদি আমি তোমার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতাম তাহলে এতে আমার প্রবৃত্তির কামনা বাসনারই আনুগত্য হতো। সুতরাং আমি বিরত রয়েছি। তোমার কাছ থেকে সরে গিয়েছি। অতঃপর যখন সে পরিবেশ ও পরিস্থিতির অবসান হলো, তখন দ্বিতীয় বার এসে তোমাকে হামলা করেছি। আমি আল্লাহর পথেই অসি চালিয়ে থাকি। আমি চাইনা যে, এতে খোদার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু প্রাধান্য লাভ করুক। একেই বলে পাহলোয়ান, একেই বলে মুজাহিদ এবং একেই বলে বীর পুরুষ।

সুতরাং হিজরতের একটি অর্থ হলো গুনাহ বা পাপ কর্ম থেকে দূরে থাকা। অনুরূপ ভাবে জিহাদেরও একটি অর্থ হলো প্রবৃত্তির কামনা বাসনার বিরুদ্ধে মুকাবিলা করা। এখন আমাদের চিন্তা করা দরকার যে, হিজরত ও জিহাদের এরূপ ব্যাখ্যা সঠিক কিনা।

একদিক বিবেচনা করলে একে সঠিক বলেই গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এর বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যাও করা হয়েছে এবং এখনো করা হচ্ছে। المهاجر من هجر السيئات 'অর্থাৎ যে ব্যক্তি গুনাহ সমূহ পরিত্যাগ করেছে সেই মুহাজির।' অনুরূপ ভাবে المجاهد من جاهد نفسه 'অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে সক্ষম সেই মুজাহিদ'। দ্বীনের অলি গণ এ উভয় বক্তব্যই বর্ণনা করেছেন। আর নবী করিম (সঃ) তো আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেনঃ প্রবৃত্তি বা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদই হচ্ছে বড় জিহাদ।'

তবে এপ্রসংগে ভুল এবং বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা যা করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে এই যে, হিজরত হচ্ছে শুধু গুনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকার নাম আর জিহাদ হচ্ছে শুধু প্রবৃত্তি বা নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করার নাম। এ রূপ অর্থ দ্বারা এক দিকে যেমন শারীরিক এবং বাহ্যিক

হিজরত থেকে পশ্চাদধাবনের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে প্রকাশ্য এবং বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ থেকে বিরত থাকার অর্থও গ্রহণ করা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, প্রয়োজনের সময় ঘর বাড়ী, সন্তান সন্ততি মা বাপ, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব প্রমুখ থেকে বিদায় নিয়ে কোথাও চলে যাওয়ার পরিবর্তে অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত হয়ে ঘরে বসে থাকব—আর এ অবস্থায়ও আমাদেরকে মুহাজিরই বলা হবে।

ঠিক অনুরূপ ভাবেই আল্লাহর পথে দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কষ্ট করার পরিবর্তে যদি কেউ ঘরের এক কোণে বসে বসে মুরাকাবার অবস্থায় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদে প্রবৃত্ত হয় তবুও তাকে মুজাহিদই বলতে হবে এবং রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈনিকগণ বা মুজাহিদদের থেকেও তার পুণ্য বা সওয়াব বেশি হবে।

যে সব লোক হিজরত দ্বারা শুধু গুনাহ থেকে হিজরত এবং জিহাদ দ্বারা শুধু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদের অর্থই গ্রহণ করেছেন এবং এর অন্য অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করেছেন তারা মূলতঃ একটি বিভ্রান্তিকর বা ভ্রান্ত ধারনার মধ্যে নিমজ্জিত।

আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামে দু'প্রকারের হিজরতএবং দু প্রকারের জিহাদের কথাই বলা হয়েছে। যদি কেউ কোন সময় এর একটিকে অন্যটির বাহানায় পরিত্যাগ করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে সঠিক ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং ইসলামের চিরন্তন আদর্শ ও শিক্ষা দীক্ষা থেকে পলায়ন করেছে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ(সঃ), আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী(আঃ), পবিত্র আত্মা ইমামগণ এবং আমাদের অলিগণ সকলেই মুহাজির ছিলেন। আর উভয় অর্থেই মুহাজির ছিলেন। তাঁরা সকলেই মুজাহিদ ছিলেন এবং উপরোক্ত উভয় অর্থেই মুজাহিদ ছিলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কোণ থেকে মানুষের জন্যে এমন কতকগুলো স্তর রয়েছে যেখানে পৌঁছার জন্যে তাকে কতকগুলো বাহ্যিক সিঁড়ির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং এটা কিছুতেই হতে পারেনা যে, যুদ্ধের ময়দানে গমন ব্যতীতই কেউ মুজাহিদ হিসেবে অভিহিত হবে এবং হিজরত না করেও কেউ মুহাজির বলে গণ্য হবে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষ এই কোর্স তথা স্তর গুলো পরিপূর্ণ না করবে, ততক্ষন পর্যন্ত তার মধ্যে যে দৃঢ়তা আসা উচিত ছিল, তা আসবে না।

ইসলামী দৃষ্টি কোণ থেকে কতিপয় কারণেই বিয়ে একটি পুণ্য কর্ম। ইসলামের এই দৃষ্টিভংগি খৃষ্টবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা খৃষ্ট ধর্মে অবিবাহিত থাকাকে পবিত্র বলে গন্য করা হয়ে থাকে। অথচ ইসলাম বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনকে পবিত্র বলে মনে করে। ইসলাম পারিবারিক জীবনের উপর এই যে গুরুত্ব আরোপ করেছে, একে পবিত্র বলে অভিহিত করেছে—এর মূলে কি কারন নিহিত রয়েছে?

পারিবারিক জীবনের পবিত্রতার একটি দিক হচ্ছে মানবীয় আত্মার প্রশিক্ষণ। মানবীয় আত্মার দৃঢ়তা এবং উন্নতি ও বিকাশ পারিবারিক জীবন ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। অর্থাৎ যদি একজন পুরুষ ও একজন নারী তাদের সমস্ত জীবনই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ব্যতীতই অতিবাহিত করে —তাহলে এ নিসংগ মানব-মানবীর আত্মা কখনো সবল ও দৃঢ় হবে না—তা অপূর্ণই থেকে যাবে। চাই তারা জীবনভর যতোই আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত থাকুক, নামাজ পড়ুক, রোজা রাখুক এবং আল্লাহতায়ালার আরাধনায় মশগুল থাকুক না কেন, তাদের আত্মা দুর্বল এবং স্থূলই থেকে যাবে। এর কারণ এই যে, সে পুরুষ কি নারী জীবনে সন্তান-সন্ততির পিতা হতে পারেনি। অথচ ইসলাম বিয়ে এবং পারিবারিক জীবনকে একটি সুন্নাত হিসেবে গণ্য করেছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, ইসলাম মানবীয়

আত্মাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মজবুত ও দৃঢ় করতে চায়। বস্তুতঃ পক্ষে যে সব উপায়-উপকরণ মানবীয় আত্মার প্রশিক্ষণের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্রিয়াশীল সে গুলোর একটি বিশেষ ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে—যার কোন বিকল্প হতে পারেনা।

অনুরূপ ভাবেই হিজরত এবং জিহাদ ও মানব জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে এমন দু'টি কারণ যার কোনই বিকল্প নেই।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ এবং গুনাহ থেকে হিজরত স্ব স্ব স্থানে ঠিকই আছে। এ ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু 'বাস্তব হিজরত' এমন একটি জিনিষ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার বিকল্প গুনাহ থেকে হিজরত হতে পারে না। আর এ ভাবেই শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ এমন একটি জিনিষ ও বিষয় যার বিকল্প কখনো নাফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হতে পারেনা। আর এ কারণেই ইসলাম এ উভয় শব্দকেই একই সংগে বর্ণনা করেছে।

আমাদের গভীর ভাবে চিন্তা করা দরকার যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের উপর কি ধরণের কর্তব্য আরোপিত হয়ে থাকে। এটা সত্য কথা যে, সব সময়ই পরিবেশ পরিস্থিতি জিহাদের অনুকূলে থাকেনা। আর এভাবে সব সময়ই হিজরতেরও উপযুক্ত পরিবেশ নয়।

তবে নবী করিম (সঃ) মানুষের কর্তব্য সমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, একজন মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার অন্তরে নিষ্ঠা এবং সদিচ্ছাকে লালন করা। আর তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটাই হওয়া উচিত যে, প্রয়োজনে সে হিজরত করবে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে সে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়বে। রাসুল (সঃ) বলেছেন :

من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، مات على شعبة من النفاق

'অর্থাৎ যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হলোনা, জিহাদের কোন কথাও বললোনা এবং এ ব্যাপারে কোন চিন্তা ভাবনাও করলোনা সে নিফাক

(কপটতা) অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করবে।'

তবে যাদের নিয়্যত বা সদিচ্ছা হচ্ছে এই যে, হিজরতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে হিজরত করবে এবং জিহাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে জিহাদ করতেও কুণ্ঠা বোধ করবেনা--তারা অবশ্যই মুহাজির এবং মুজাহিদের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে :

لايستوي القاعدون من المؤمنين، غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكُلاً وعدالله الحسنى، وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً

'মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহর পথে স্বীয় সম্পদ ও জীবন বিসর্জন দিয়ে জিহাদ করে তারা কখনো সমান হতে পারেনা। যে সব মুজাহিদ স্বীয় ধন-সম্পদ ও জীবন বিলিয়ে দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহতায়ালা তাদের, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা সকলের জন্যেই সুন্দর এবং কল্যানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদের আল্লাহতায়ালা মহা পুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' (সূরা নিসা : ৯৫)

আলোচ্য আয়াতে যে ঘরে অবস্থানকারী লোকদের কথা বলা হয়েছে তার মানে খোদাদ্রোহী নয়। কেননা, তারা তো কোন হিসাবের মধ্যেই গণ্য নয়। বরং এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে যারা বিশেষ কোন ওজরের কারণে জিহাদে শরীক হতে পারছেনা এবং ঘরেই অবস্থান করছে। আর যারা অচল অক্ষম, অন্ধ ও পংগু কিন্তু তাদের মধ্যে এ সদিচ্ছা রয়েছে যে, তাদের যদি এ সব

অসুবিধা ও ত্রুটি না থাকতো, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্যে সকলের চেয়ে অগ্রগামী থাকতো। পবিত্র কুরআন তাদের বিপক্ষে বলেনি। বরং তাদের সদিচ্ছা ও নিয়্যতের বিশুদ্ধতার কারনে তারাও (সম্ভবতঃ) মুজাহিদদের মধ্যেই গণ্য।

আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী (আঃ) যখন সিফফিনের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললোঃ 'হে, আমিরুল মুমেনীন! আমি চেয়ে ছিলাম যে, আমার ভাইও আপনার সংগী হোক এবং সেও সৌভাগ্য অর্জন করুক। 'আমাদের জানা থাকা দরকার যে, তখন হযরত আলী তার একথার কি জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'আমাকে এটা বলো যে, তার নিয়্যত কি ছিল? তার অন্তরের অভিলাষ কি ছিল? তোমার ভাই কি কোন ওজর থাকার দরুণ আসতে পারেনি? না বিনা কারণেই আসেনি? যদি কোন ওজরও ছিলনা এবং আসেও নি, তাহলে তার আসার অপেক্ষা না আসাই আমাদের জন্যে ভালো হয়েছে। আর যদি সে কোন বিশেষ ওজর থাকার দরুন আসতে পারেনি, কিন্তু তার হৃদয় মন আমাদের সংগেই ছিল, তাহলে তার ইচ্ছা ও আকাংখা যখন আমাদের সংগে ছিল তখন সে আমাদের সংগেই ছিল। শুধু তাই নয়, আমাদের সংগে সে সব লোকও ছিল যারা এখনো তাদের পিতা-মাতার ঔরসে রয়েছে। আর এধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। যদি এমন লোক পাওয়া যায়, যাদের অন্তরের অন্তস্থলে এ আকাংখা রয়েছেঃ হায়! যদি আমরা আলীর সংগে থাকতে পারতাম এবং তাঁর সংগে থেকে যুদ্ধ করতাম! তাহলে এসব লোক আমাদের কাছে সিফফিনের যোদ্ধাদের মধ্যেই গণ্য।

মাহ্‌দীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা : انتظار الفرج

হযরত ইমাম মাহদী(আঃ)এর আবির্ভাবের প্রতীক্ষার অর্থ কি? أفضل الأعمال انتظار الفرج 'অর্থাৎ ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় থাকা উত্তম কাজ—একথার সাক্ষ্যের অর্থ কি? কিছু সংখ্যক লোক এরূপ ধারণা করছে: আমরা এ জন্যে অপেক্ষমান থাকবো যে, ইমাম মাহদী(আঃ)তাঁর বিশেষ সহচর—যার সংখ্যা তিনশ' তের জন, এবং সাধারণ সহচরদের সংগে নিয়ে আবির্ভূত হবেন। অতঃপর বিশ্বের বুক থেকে ইসলামের সকল শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এখানে শান্তি, নিরাপত্তা এবং পরিপূর্ণ আজাদী বহাল করবেন। এরপর তিনি আমাদেরকে আহ্বান করবেন—'আসুন' 'আর আমরাতো এরূপ আবির্ভাবেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি। আর এ ধরনের আমলই উত্তম আমল।

প্রকৃত পক্ষে ইমামের আবির্ভাবের প্রতীক্ষার মানে হচ্ছে তার সাহচর্য কামনা করা। তাঁর সংগে থেকে জিহাদে শরীক হওয়া এবং শাহাদাত বরণ করা। অর্থাৎ আল্লাহর পথে আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রকৃত মুজাহিদ হওয়ার আকাংখা। মাহদীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা বা আকাংখার অর্থ এই নয় যে, আমরা কাউকে বলব—তোমরা যাও এবং সমস্ত কাজ সম্পন্ন করো। অতঃপর যখন সকল কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং সুযোগ সুবিধার সময় উপস্থিত হবে তখন আমরা আসব। অর্থাৎ যত রকমের কায়-ক্লেশ ও অসুবিধা আছে তা অন্যদের জন্যে এবং সুযোগ সুবিধা সমূহ হচ্ছে আমাদের জন্যে। এটা হচ্ছে মূলতঃ হযরত মূসা(আঃ) এর জাতির লোকদের বৈশিষ্ট্য। তারাও হযরত মূসা(আঃ)কে বলেছিল :

اذهب انت وربك فقاتلا، انا هاهنا قاعدون

অর্থাৎ 'আপনি এবং আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। (সূরা মায়েদা : ২৪)

এ কথা তারা ঠিক সে সময়ই বলেছিল, যখন তারা ফিলিস্তিনের নিকটবর্তী হয়েছিল এবং দেখতে পেল যে, যুদ্ধবাজ লোকদের একটি দল সেখানে মোতায়েন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই তারা মূসা(আঃ)কে বলেছিল যে, আপনি আর আপনার খোদা গিয়ে যুদ্ধ করুন। যখন তারা পর্যুদস্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এ ভূখন্ড শত্রু মুক্ত হয়ে যাবে তখন ঘর বাড়ী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে আমাদেরকে সংবাদ দিবেন যে, এখন আর কোন রকমের আশংকা নেই, কাজেই তোমরা এসে পড়। এরপরই আমরা চলে আসবো এবং শান্তিতে জীবন যাপন করবো। হযরত মূসা তাদের এ কথার জবাবে বললেন: তাহলে তোমাদের আর কি কর্তব্য বাকি রইলো? তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর দুশমনদের এই ভূখন্ড থেকে বহিস্কার করা, তাদের দখলদারীর অবসান ঘটানো এবং নিজেদের ঘরকে তাদের কবল থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা।

আর এরই বিপরীতে মহানবী(সঃ)এর সংগ্রামে তাঁর সংগীদের কি ভূমিকা ছিল আমরা তাও প্রত্যক্ষ করতে পারি। মিকদাদের মতো সাহাবাগণ তাঁর সমীপে এ ভাবে আত্ম নিবেদন করে ছিলেন: 'হে, আল্লাহর রাসূল! আমরা হযরত মূসার জাতির মতো আপনার সংগে কথা বলব না। বনি ইসরাইলগণ হযরত মূসার সংগে যে সব আচরণ করেছে, যে সব কথা বলেছে আমরা তা করব না। 'তারা বলেছিলেন :

لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق وأعطيناك مواثيقنا على السمع ولطاعة، فامض يارسول الله لماأردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره ان تلقى بنا عدونا غداً

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি আপনাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করেছি এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিচ্ছি—ঘোষণা করছি, আমরা আপনার সংগে এই অংগীকার করছি যে, আপনার কথা শুনবো এবং আপনার আনুগত্য করবো। অতএব, হে, আল্লাহর রাসূল! আপনি যা ইচ্ছা হুকুম করুণ—আমরা আপনার সংগেই আছি। সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, যদি আমাদের সম্মুখে এই সমুদ্রও অনুরায় হয়, আর যদি আপনি তাতেও ঝাঁপ দেন তাহলে আমরাও আপনার সংগে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো। আমাদের থেকে কোন লোকই পশ্চাদধাবন করবে না। আর আগামী দিন আমাদের সংগে শত্রুর মুকাবিলাকে আমরা অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে দেখব না—অর্থাৎ আগামী দিন সন্তুষ্ট চিত্তে আমরা শত্রুর সংগে যুদ্ধ করবো।' ৬

প্রকৃত প্রস্তাবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আমরা যেন অতীব নিষ্ঠার সংগে অন্তরে এ আশা পোষণ করি যে, তাঁর আবির্ভাবের পর তার সাহচর্যে থেকে এ পৃথিবীর সংস্কার কার্যে আত্ম নিয়োগ করবো।

يالیتنا کنا معك فنفوز فوزاً عظیماً

অর্থাৎ 'হায়! আমরা যদি আপনার সংগে থাকতাম, তাহলে আমরা বিরাট সাফল্যই লাভ করতে পারতাম।' এটি এমন একটি বাক্য যা আমরা সব সময়ই ইমাম হোসাইনের প্রসংগে বলে থাকি। কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি খুব গুরুত্ব সহকারে আমরা তাকিয়ে দেখিনা। আসলেএর অনুর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে এই: হে, আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু ও অভিভাবক! কতইনা ভালো হতো যদি আমরা আপনার সংগে কারবালার ময়দানে উপস্থিত থাকতাম এবং শাহাদাত বরণ করে চরম সাফল্য অর্জন করতে পারতাম। আমাদের এই দাবী কি

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? কিছু সংখ্যক লোকতো অবশ্যই আছেন যারা সত্যিকার অর্থেই এই রূপ দাবী করে থাকেন। আর অধিকাংশ লোকের দাবী হচ্ছে শুধু মৌখিক দাবী—যা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। হযরত ইমাম হোসাইন(আঃ)আশুরার রাতে বলেছিলেন:

ما رأيت أصحاباً أبرّ وأوفى من أصحابي

'আমি আমার সংগীদের চেয়ে উত্তম ও বিশ্বস্ত আর কারো সংগীদেরকে দেখিনি।' শিয়া সম্প্রদায়ের একজন বুজুর্গ আলেম বলেছিলেন :'আমার এটা বিশ্বাসই হয় না যে, হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)এইরূপ কথা বলে ছিলেন। কেননা, আমি বিশ্বাস করতাম যে, ইমামের সংগীগণ কোন বিশেষ কর্ম সম্পাদন করেন নি। কারণ তাঁর শত্রুগণ তাঁর সাথে চরম নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিকতার পরিচয় দিয়েছিল। হোসাইন ছিলেন মুমিনদের ইমাম, রাসুল(সঃ) এর দৌহিত্র, আলী এবং ফাতেমা জহুরার সন্তান। সুতরাং এ অবস্থায় একজন সাধারণ মুসলমানও তাঁর সাহায্য না করে পারেনা। কাজেই কারবালার সমর ক্ষেত্রে যারা তাঁর সাহায্য করে ছিলেন, তারা তেমন কোন বড় কীর্তি সম্পাদন করেন নি। আর যারা তাঁর সাহায্য করেনি তারা তো বিরাট ভুল ও অন্যায়ই করেছে।'

এরপর উক্ত বুজুর্গ বলেন:অতঃপর আল্লাহতায়ালা আমাকে এ ভুল ধারণা ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তি দিলেন। সুতরাং একদিন রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম--আমি কারবালা ময়দানে হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)এর সংগে সাক্ষাৎ করেছি। সাক্ষাতের পর তাঁকে বললাম :হে, আমার মাওলা! আমি আপনার দরবারে এই জন্যেই উপস্থিত হয়েছি যে, আপনার সাহায্য করবো এবং আপনার সাহচর্য লাভ করে ধন্য হবো। ইমাম বললেন:'ঠিক আছে সময় আসলে পরে তোমাকে জানিয়ে দেব।' এমন সময় নামাজের(জোহরের নামাজের) সময় হয়ে গেল।[৭]

আবু আবদুল্লাহ হোসাইন বললেন: আমি নামাজ পড়তে চাই। আর তুমি এখানে অবস্থান করে দুশমনের হামলা প্রতিহত করো। দুশমনের পক্ষ থেকে যদি কোন তীর নিক্ষিপ্ত হয়, তাহলে সামনে অগ্রসর হয়ে তা প্রতিহত করবে। আমি বললাম: ঠিক আছে, আমি এখানেই অবস্থান করবো। অতঃপর আমি ইমামের সম্মুখে গিয়ে দাড়ালাম। তিনি নামাজে দাড়িয়ে গেলেন। আমি সহসা দেখতে পেলাম যে, একটি তীর তীব্র বেগে ইমামের দিকে ছুটে আসছে। যখন তীরটি খুব কাছে এসে পৌঁছালো, তখন অনিচ্ছাকৃত ভাবেই আমি কিছুটা পিছনের দিকে সরে গেলাম। আর অমনি তীরটি ইমামের পবিত্র দেহে বিদ্ধ হলো। আমি সহসা বলে উঠলাম :

استغفر الله وأتوب اليه

আহ! আমি কি করলাম? আমি তো মারাত্মক ভুল ও অপরাধ করেছি। ঠিক আছে, আর এমনটি করবোনা। ইত্যবসরে আরেকটি তীর এসে ইমামের পবিত্র দেহে বিদ্ধ হলো। অথচ এবারও আমি নিজেকে বাচাবার উদ্দেশ্যে পিছনে সরে দাড়ালাম। এই ভাবে তৃতীয় বারও আমি অনুরূপই করলাম। আর একের পর এক তীর এসে ইমামের পবিত্র শরীরে বিদ্ধ হতে লাগলো।

অতঃপর আমি সহসা ইমামের দিকে তাকালাম। তিনি স্মিত হাস্যে বললেন:

ما رأيت أصحاباً أبرّ و اوفى من أصحابي

অর্থাৎ আমি আমার সংগীদের চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত ও উত্তম আর কারো সংগীদের দেখিনি। তোমরা নিজেদের ঘরে বসে সব সময় বলছো:

ياليتنا كنا معك فنفوز فوزاً عظيماً

হায় আমরা যদি আপনার সংগে থাকতাম তাহলে আমরা বিরাট সাফল্যই অর্জন করতে পারতাম।' তবে বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থাৎ কাজের সময়েই বুঝা যাবে যে, তোমাদের এ দাবী কতটা সত্য? আমার সংগীগণ ছিল সত্যিকারের কাজের লোক, শুধু মৌখিক দাবীর অধিকারী ছিলেন না।'

কথাবার্তা এ পর্যন্তই হলো। সম্ভবতঃ জহুরের নামাজের সময়ও তখন এসে গিয়েছে। সে আবু আবদুল্লাহ আল হোসাইনের নামাজের সময় —আশুরার দিন। এই পৃথিবীতে এটাই ছিল তাঁর সর্বশেষ নামাজ। তাঁর সংগীদের অনেকেই জহুরের নামাজের পূর্বেই শহীদ হয়ে ছিলেন। অর্থাৎ আশুরার জহুর পর্যন্ত তাঁর কিছু সংখ্যক সংগী সমস্ত আহলে বাইত এবং তিনি নিজে জীবিত ছিলেন।

তাঁর কিছু সংখ্যক সংগী সর্ব প্রথম ঠিক ঐ সময়ই শাহাদাত বরণ করলেন যখন উভয় পক্ষ একে অন্যের সম্মুখীন হলো এবং অবলীলা ক্রমে তীর বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। ইমাম হোসাইন(আঃ)এর ছিল ক্ষুদ্র একটি সৈন্য বাহিনী—যার লোকসংখ্যা ছিল মাত্র বাহাত্তর জন। কিন্তু তারা ছিলেন বিপুল সাহসের অধিকারী। শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বে তাঁদের তুলনা ছিল না। মোট কথা, অতুলনীয় বীরত্বের পরিপূর্ণ লক্ষণ সমূহ তাদের মধ্যে দেদীপ্যমান ছিল। হযরত ইমাম হোসাইনের চেহেরায় তখন উজ্জ্বল জ্যোতি জ্বল জ্বল করছিল। এই ক্ষুদ্র সৈন্য বাহিনীকে তিনি একটি যথার্থ সৈন্য বাহিনী হিসেবে সুসজ্জিত করলেন। সৈন্য সংগঠিত করার নিয়ম অনুসারে ডানে, বামে এবং কেন্দ্রে বা মধ্যস্থলে সৈন্য মোতায়েন করলেন। ডান দিকের বাহিনীর অধিনায়ক করলেন জুহাইর ইবনে কাইয়ান কে, বাম দিকের বাহিনীর জন্যে মনোনীত করলেন হযরত হাবীব ইবনে মুজাহিরকে এবং সৈন্য বাহিনীর পতাকা অর্পন করলেন স্বীয় বিশ্বস্ত ও আত্ম ত্যাগী ভাই আবুল ফজল আল আব্বাসের হস্তে। আর এ কারণেই

হযরত আব্বাসকে হোসাইনের পতাকাবাহী বলা হয়ে থাকে। সৈন্য সুসংগঠিত করণের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁর সংগীগণ যুদ্ধ করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ইমাম হোসাইন(আঃ) বললেনঃ না— যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুপক্ষ যুদ্ধ শুরু না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তা শুরু করতে পারি না।'

উমর ইবনে সাদ শুরু থেকেই ধন সম্পদের অভিলাষী ছিলো। সে দ্বীন ও দুনিয়া এ উভয়টাই অর্জন করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ একই সংগে 'খুর্মা এবং সওয়াব'। সে চেয়েছিল ইবনে জিয়াদের নিকট থেকে 'রাই'(ইরান)এর শাসন তার অর্জন করবে এবং ইমাম হোসাইনের শোণিত দ্বারা তার হাতও রঞ্জিত না হোক। আর এ জন্যেই সে সন্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে ইবনে জিয়াদের সংগে অনবরত পত্রালাপ করছিল—যাতে যুদ্ধ না হতে পারে। কিন্তু ইবনে জিয়াদ তার আসল উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরে তাকে কড়া ভাষায় পত্র দিলোঃ হয় যুদ্ধের কাজ সত্বর সম্পন্ন করো, আর যদি তা করতে অনিচ্ছুক থাকো, তা হলে যুদ্ধের দায়িত্ব তার এই ব্যক্তির উপর অর্পণ কর—যাকে আমি এই পত্র সহ প্রেরণ করছি।

এই পত্র প্রাপ্তির পর তাকে দ্বীন এবং দুনিয়া অর্থাৎ এই পৃথিবীর সম্পদ বৈভব অর্জন অথবা দীনের অনুসরণ এতদুভয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলো। তথা হয় সম্পূর্ণ দ্বীন অথবা পুরোপুরি দুনিয়া। পরিশেষে সে দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। সে বললোঃ 'হাঁ, আমি যুদ্ধ করবো এবং আমার কর্মকর্তার পূর্ণ আনুগত্য করবো।'

আশুরার দিনে উমর ইবনে সাদ যে নীচতার পরিচয় দিয়েছিল তার কারণ ছিল এই যে, সে ভেবেছিল, ইবনে জিয়াদ হয়তো এই রিপোর্ট পেয়েছে যে, সে ইমাম হোসাইনের পক্ষাবলম্বন করছে। সুতরাং ইবনে জিয়াদের সন্তুষ্টির নিমিত্ত এবং নিজের যাবতীয়

দোষ খন্ডন করার জন্যে সে আশুরার দিনে সীমাহীন ধৃষ্টতা ও নীচতার পরিচয় দিয়েছিল।

যখন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ মুখোমুখি হলো তখন সে তার তীরন্দাজ বাহিনীকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিলো। তার নির্দেশ অনুসারে সবাই তৈরী হয়ে গেলো। অতঃপর সকলের আগে সে ইমামের তাঁবুর দিকে তীর নিক্ষেপ করলো এবং চীৎকার করে বললো : হে, লোকেরা সাক্ষী থেকো। সর্ব প্রথম আমিই ইমাম হোসাইনের তাঁবুর দিকে তীর নিক্ষেপ করলাম। তোমরা অবশ্যই ইবনে জিয়াদের নিকটে আমার এই তীর নিক্ষেপের সাক্ষ্য দিবে। [৮]

অতঃপর যখন আমি কারবালার এই মর্মন্তুদ ঘটনার এই পর্যায়ে এসে পৌঁছি তখন বিশিষ্ট আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব মরহুম আয়াতীর কথা আমার মনে পড়ে। যিনি ছিলেন আমাদের সকলেরই অত্যন্ত আপনজন এবং প্রায় দশ বছর পূর্বে আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। হয় আমি তাঁর নিকট থেকে শুনেছি অথবা তাঁর কোন গ্রন্থে পড়েছি। তিনি বলেছেন : 'কারবালার যুদ্ধ একটি তীর নিক্ষেপের মাধ্যমেই শুরু হয়েছে এবং একটি তীর নিক্ষেপের মাধ্যমেই এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।' উমর ইবনে সাদ যে তীর নিক্ষেপ করেছিল, তার মাধ্যমেই যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কিন্তু আপনাদের কি জানা আছে যে, কোন তীরের মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল?

এমন একটি মুহূর্তও ঘনিয়ে এসেছিল যে, যখন যুদ্ধের গোটা পরিস্থিতিই পরিবর্তিত হলো। দু'পক্ষের মধ্যকার যুদ্ধ এক তরফা যুদ্ধে পরিণত হলো। আর এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঠিক তখনই হলো যখন কারবালার এই ভয়াবহ রণক্ষেত্রে আবু আবদুল্লাহ আল হোসাইন নিঃসংগ হয়ে পড়লেন। বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের পরও এক পর্যায়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ তাঁর কপালে একটি পাথর এসে লাগলো। তিনি জামার আঁচল দিয়ে কপালের শোণিত ধারা

মুছতে চেয়েছিলেন, এমনি সময় হঠাৎ একটি তীর এসে তাঁর বুকে বিদ্ধ হলো। এই ভাবেই ইমামের লড়াই সমাপ্ত হলো। যুদ্ধের শ্লোগানের পরিবর্তে তিনি আল্লাহর দরবারে মুনাজাতে রত হলেনঃ

«بسم الله و بالله وعلى ملة رسول الله»

ইমাম হোসাইনের সংগীদের মধ্যে একজন ছিলেন আবেস ইবনে আবি শাবীব শাকেরী। তিনি একজন বিখ্যাত বীর পুরুষ ছিলেন। শহীদ কুল শিরোমণি ইমাম হোসাইনের বীরত্বের কিছু নির্দশন তার মধ্যে পাওয়া যেতো। তিনি ময়দানে আসলেন। তার সংগে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে তিনি প্রতিপক্ষের লোকদেরকে আহ্বান করলেন, কিন্তু কেউই আসতে সাহস করলো না। কেউই বেরিয়ে এলোনা। অবশেষে আবেস অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এলেন। তিনি মাথা থেকে 'হেলমেট' খুলে ফেললেন এবং যুদ্ধের পোষাকও দেহ থেকে ফেলে দিলেন। অতঃপর ময়দানে এসে বললেন : 'আস এবং আবেসের সংগে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হও।' কিন্তু এরপরেও কেউ সম্মুখে আসতে সাহস করলো না। অতঃপর কাপুরুষের মতো সমর নীতি বহির্ভূত পন্থায় তাঁর উপর হামলা করা হলো। পাথর, তীর এবং ভাঙা তলোয়ার দ্বারা তাকে আঘাত করা হলো। এই ভাবেই তিনি শহীদ হলেন।

আশুরার দিন ইমাম হোসাইন(আঃ)এর সংগীগণ যে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন তা কেয়ামতের দিন পর্যন্ত একটি জীবন্ত ও স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। তারা এই পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা, ত্যাগ তিতিক্ষা এবং বিশ্বস্ততার জীবন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। পুরুষদের কথাতো স্বতন্ত্র এমন কি মহিলাগণও সীমাহীন শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত

মানব জাতির ইতিহাসে তাঁদের এ মহান কীর্তিমালা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমায়ের কালবী ইমামের একজন উত্তম সংগী ছিলেন—যার মা এবং স্ত্রীও কারবালার ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খুবই শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি তখন যুদ্ধের জন্যে ময়দানে যাচ্ছিলেন। তখন তার নব পরিণীতা স্ত্রী এগিয়ে এসে তাকে প্রতিহত করতে চাইলেন: 'কোথায় যাচ্ছো? আমাকে কার কাছে সোপর্দ করে যাচ্ছো?' সহসা তার মা এগিয়ে এসে বললেন: 'হে, আমার ছেলে, কখনো মেয়ে লোকের কথায় কর্ণপাত করবে না। আজ তোমার পরীক্ষার দিন। আজ যদি তুমি ইমামের জন্যে আত্ম ত্যাগ না করো তাহলে আমি দুধের দাবী ছাড়বো না।' এরপর আবদুল্লাহ ময়দানে গিয়ে বীরত্বের সংগে লড়াই করলেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন। পুত্রের শাহাদাতের পর আবদুল্লাহর বৃদ্ধ মাতা তাবুর খাঁট সংগ্রহ করে দুশমনদের উপর হামলা শুরু করে দিলেন। কিন্তু ইমাম এগিয়ে এসে তাকে বাধা দান করলেন। বললেন: 'হে, প্রত্যাবর্তন করো। আল্লাহতায়ালা মেয়েদের উপর যুদ্ধ ফরজ করেন নি। ইমামের কথা অনুসারে তিনি ফিরে এলেন। কিন্তু শত্রুগণ চরম নীচতার পরিচয় দিলো। তারা আবদুল্লাহর দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করে তাঁর মায়ের দিকে নিক্ষেপ করলো। মা তাঁর শহীদ পুত্রের মাথা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে চুমু খেলেন। তাকে ধন্যবাদ জানালেন। বললেন: 'শাবাস, হে, আমার পুত্র, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি তোমার দুধকে হালাল করেছো। আমি আল্লাহর পথে প্রদত্ত জিনিষকে পুনরায় ফেরত নেইনা।'

যে সব লোক ইমাম হোসাইনের নিকট জিহাদের অনুমতি চেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে দশ বছরের একটি কিশোরও ছিল। সে কোমরে তলোয়ার বেঁধে ইমামের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো।

নিবেদন করলো:'আমাকে রণাংগনে যাবার অনুমতি দিন।'ইতিহাস বলে : وخرج غلام قتل أبوه في المعركة

অর্থাৎ এ ছিলো সেই কিশোর যার পিতা ইতিপূর্বে রণক্ষেত্রে শহীদ হয়েছেন। ইমাম বললেন:'না, তুমি ছেলে মানুষ। কাজেই তুমি যাবে না।'কিন্তু কিশোর বললো:'না, আমাকে যেতে দিন।'ইমাম বললেন: সম্ভবতঃ তোমার মা এতে রাজী হবেন না।'অতঃপর সে বললো: 'হে, ইমাম! আমার মাতো যুদ্ধে যাবার জন্যেই আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন যে, তুমি যদি ইমাম হোসাইনের জন্যে নিজেকে উৎসর্গীকৃত না করো, তাহলে আমি সন্তুষ্ট নই।'এ কিশোর ছিল অতিশয় ধার্মিক ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। সে তার আত্ম ত্যাগের মাধ্যমে এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে যা অন্য শহীদরা করতে পারেনি। কেননা, যখনই কোন মুজাহিদ যুদ্ধের ময়দানে যেতেন তখন নিজের পরিচয় ব্যক্ত করে যেতেন, কিন্তু এই কিশোর নিজের পরিচয় ব্যক্ত করে নি। যার কারণে ইতিহাসে তার নাম উল্লেখিত হয়নি যে, এ কে ছিলো? কোন সাহাবীর সন্তান ছিল? শুধু ইতিহাসে এতটুকুই উল্লেখিত হয়েছে যে, একটি যুবক যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে এলো যার পিতা ইতিপূর্বে রণাংগনে শহীদ হয়েছেন। তাহলে সে কি যুদ্ধ সংগীত পাঠ করেনি? কেন পাঠ করেনি? হাঁ, সে পাঠ করেছে, তবে অত্যন্ত চাপা কন্ঠে। অনেকেই হয়তো তা অনুসরণ করতে পারেন। যখন সে ময়দানে গেলো তখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার মুখ থেকে এই কথা গুলো বেরিয়ে এলো :

«أميري حسين و نعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير»
«علي وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير»

অর্থাৎ'হে, লোকেরা! আমার আত্ম পরিচয়ের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমার পরম হিতৈষী পরিচালক(আমীর) হচ্ছেন ইমাম

হোসাইন(আঃ)। আর আমার পরিচালক কতই না উত্তম ব্যক্তি— যিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ(সঃ)এর অনুরূপ। আলী এবং ফাতেমা হচ্ছেন তাঁর জনক-জননী। হে, লোকেরা! এই পৃথিবীতে তার কোন দৃষ্টান্ত আছে বলেকি তোমাদের জানা আছে?

«اللّهمّ ارزقنا توفيق الطاعة، وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الرحمة واكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد السنتنا بالصواب والحكمة و املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة.

اللّهم نوّر قلوبنا بنور الايمان.

اللّهم واجعلنا من المهاجرين والمجاهدين حقا في سبيل إعلاء كلمة دينك.

اللّهم وانصر المسلمين على أعدائهم في كافة الجبهات.

اللّهم وارجع سهام شر اليهود الى نحورهم.

اللّهم اشف مرضى المسلمين.

اللّهم واجعل قلب امام زماننا راضياً عنا جميعا.

اللّهم وتفضل على أمواتنا بالرحمة والمغفرة».

হে, খোদা! আমাদেরকে আপনার বন্দেগী করার এবং গুনাহ সমূহ থেকে দূরে থাকার শক্তি দান করুন।

হে, খোদা! আমাদেরকে বিশুদ্ধ নিয়্যত এবং আপনার রহমত অনুধাবন করার শক্তি দিন। আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করুন এবং দৃঢ়তা দান করুন।

হে, খোদা! আমাদের জিহ্বাকে সঠিক কথা বলার শক্তি দিন এবং আমাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা বিভূষিত করুন। হে, খোদা, আমাদের অন্তর সমূহকে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন।

হে, খোদা! আমাদের অন্তর সমূহকে ঈমানের আলো দ্বারা আলোকিত করে দিন। হে, খোদা। আমাদেরকে আপনার দ্বীনের কালেমা বুলন্দ করার পথে সত্যিকার মুহাজির এবং মুজাহিদে পরিণত করুন।

হে, খোদা! জিহাদের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে শত্রুর উপর বিজয় দান করুন। হে, খোদা! ইহুদীদের অপরাধ পূর্ণ হামলা সমূহ তাদের দিকেই ধাবিত করুন।

হে, খোদা! মুসলমানদের মধ্যে যারা আজ রোগাক্রান্ত তাদের সত্বর আরোগ্য দান করুন। হে, খোদা। ইমাম মাহদী(আঃ)এর অন্তরকে আমাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট রাখুন।

হে, খোদা! আমাদের মধ্য থেকে যারা দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন তাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন এবং তাদের ক্ষমা করে দিন।

ولاحول ولاقوة إلاّ بالله العلي العظيم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سرّه ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد(ص) وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذبالله من الشيطان الرجيم:

«ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً»[١٤].

'আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশে হিজরতের জন্যে নিজ গৃহ থেকে বের হয় অতঃপর এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার পুরস্কার আল্লাহতায়ালাই প্রদান করবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল।' (সূরা নিসা : ১০০)।

গতকাল 'হিজরত ও'জিহাদ'—ইসলামের এই দু'টি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। 'হিজরত' এবং'জিহাদ' এ দুটি এমন জিনিস যার অস্তিত্ব আবহমান কাল ধরে ইসলামে রয়েছে এবং পবিত্র কুরআনেও বারংবার এ বিষয় দু'টি একই সংগে উল্লেখিত হয়েছে। আমাদের আজকের আলোচনা মূলতঃ গতকালকের আলোচনারই উপসংহার বা পরিসমাপ্তি। আজকের আলোচনায় আমরা এ কথাটি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবো যে, নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে মানবাত্মার প্রশিক্ষণ ও পূর্ণতার জন্যে এ দু'টি বিষয় কতখানি প্রভাবশীল ভূমিকা পালন করে। আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, হিজরত এবং জিহাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কি ভাবে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে।

আর এ বাড়াবাড়ির প্রকৃত স্বরূপই বা কি আমরা তাও উল্লেখ করেছি।

একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখুন, আমরা যদি হিজরত এবং জিহাদকে সামগ্রিক তথা বস্তুগত অথবা আধ্যাত্মিক যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি, তাহলে অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো যে, হিজরত হচ্ছে এমন একটি জিনিস ও পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা, যাকে কেউ আকড়ে ধরে আছে অথবা সে জিনিস বা পরিবেশটিই কাউকে আকড়ে ধরে আছে। আর জিহাদ হচ্ছে এমন একটি জিনিস যা শত্রুর বিরুদ্ধেও হতে পারে অথবা নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও হতে পারে। মোটকথা, হিজরত এবং জিহাদ হচ্ছে এমন দু'টি বিষয়, যদি তা না হতো তাহলে মানুষের ভাগ্যে পরাধীনতা বন্দীত্ব এবং শোচনীয় দুর্গতি ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। মানুষ তখনই সত্যিকার মানুষ রূপে গণ্য হতে পারে যখন সে এ ধরণের জিনিস সমূহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে সক্ষম হয়—যা তাকে আকড়ে ধরে আছে অথবা সে নিজেই যে গুলোকে আকড়ে ধরেছে। আর এর বিপরীত যখন কোন মানুষ এ ধরণের বৈষয়িক ও বস্তুগত পরিবেশে আটকা পড়ে যায়, যেখান থেকে বের হয়ে আসার মতো তার আর কোন শক্তি সামর্থই থাকেনা। তাহলে তাকে আর স্বাধীন মানুষ বলে মনে করা যেতে পারে না। সে কোন স্বাধীন মানুষের পদবাচ্যই হতে পারে না। বরং এধরণের মানুষ একান্তই বন্দী এবং পরাধীন। বা এতটুকু বলা যেতে পারে যে —সে নিতান্তই একজন গো বেচারা মানুষ।

আমরা যদি হিজরতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করি যা সম্পূর্ণতই সফর বা ভ্রমন বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে তাও একটি প্রশ্নের উদ্রেক করে। আর তা হচ্ছে এই যে, মানুষের জন্যে সফর বা ভ্রমন উত্তম না ঘরের নিভৃত কোণে বসে থাকা উত্তম? তবে এ দ্বারা এটা বুঝানো

হচ্ছে না যে, মানুষ শুধু পরিভ্রমনই করতে থাকবে, কোন সময়েই ঘরে আসতে পারবেনা এবং তার কোন নির্দিষ্ট দেশও থাকবে না। ১ মানুষের জন্যে এটা কি উত্তম হতে পারে যে, সে একটি নির্দিষ্ট দেশেই বসবাস করবে এবং কোন সময়েই সে দুনিয়ায় কোথাও ভ্রমন বা সফরের উদ্দেশ্যে বের হবেনা অথবা সফর মানুষের জন্যে কল্যানকর? আসলে সফর বা পরিভ্রমনও হিজরতেরই অনুরূপ।

সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে দেশ ভ্রমনের প্রশংসা করা হয়েছে। যদিও দেশ ভ্রমন বা সফর এই অর্থে—যেমন অতীত কালে লোকেরা সব সময়ই ভ্রমনের মধ্যে ছিল এবং কোথাও তাদের স্থায়ী বাসস্থান ছিলনা, ঠিক হবে না, কিন্তু যদি মানুষ শুধু একটি নির্দিষ্ট গ্রাম বা পল্লীতেই জীবন যাপন করতে থাকে এবং কখনো সে উক্ত গ্রাম বা পল্লীর বাইরে না যায়, অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট শহরেই বসবাস করে এবং এর বাইরে যাবার তার কোন অবকাশ না হয়, অথবা কোন নির্দিষ্ট দেশেই বসবাস করছে, কিন্তু তার বাইরে যাবার তার কোন সুযোগ হয়নি, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তার মধ্যে একটি দুর্বলতা থেকে যাবে। অর্থাৎ দেশ ভ্রমন সংক্রান্ত এই অভিজ্ঞতা তার অন্তরকে দুর্বল করে দিবে।

এর বিপরীত যদি মানুষের জন্যে দেশ ভ্রমনের সৌভাগ্য অর্জিত হয় —তথা বিশেষ করে উচ্চ মর্যাদা, সৌভাগ্য এবং চরিত্র বৈশিষ্ট্য অর্জনের লক্ষ্যে কেউ দেশ ভ্রমনে বের হয় বা কারো ভাগ্যে দেশ ভ্রমনের সুযোগ ঘটে, তাহলে এ দ্বারা সে পাঁচ প্রকারের উপকারিতা লাভ করতে পারে।

(ক) চিন্তার অবসান: দেশ ভ্রমনের ফলে মানুষের মন থেকে দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনার অবসান হয় এবং আনন্দ স্ফূর্তি জন্ম লাভ করে। মানুষ যখন কোন একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বসবাস করতে থাকে, তখন অতীতের স্বাচ্ছন্দ্যহীন জীবন ও দুর বসস্থার কথা তার

মনে পড়ে। বার বার মনে পড়ে অতীত জীবনের দুঃখ সুখময় ঘটনাবলীর কথা। আর এই সব ব্যথা বেদনা এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কাহিনী তার অন্তর কে তোলপাড় করে তোলে। কিন্তু যখন সে দেশ ভ্রমনের ইচ্ছা পোষণ করে এবং দেশের বা নিজ শহরের বাইরে কোথাও চলে যায় তখন তার জীবনের এই সব তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা এবং স্বাচ্ছন্দ্যহীন জীবনের সমুদয় ঘটনাবলী তার অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে যায় বৈকি। মোট কথা, এর মাধ্যমে প্রথমতঃ যে উপকারিতা অর্জিত হয়ে থাকে তা হচ্ছে এই যে, একজন লোক তার মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে। মানুষের অন্তর এবং মন যা সব সময়ই অতীতের ঘটনাবলীকে স্মরণ করে ব্যথিত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অন্তত কিছু সময়ের জন্যে হলেও সুখানুভব করে থাকে।

খ) জীবিকা উপার্জনঃ কারো মধ্যে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে দেশ ভ্রমনের মাধ্যমে সে অর্থোপার্জনের সুযোগ লাভ করতে পারে। অর্থোপার্জন এবং জীবনকে সুন্দর রূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে মানুষের চিন্তা ভাবনার মধ্যে কোন প্রকার সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা না থাকাই উচিত। অধিকন্তু মানুষ যখন একটি পরিবেশ ও গন্ডি থেকে বের হয়ে অন্য একটি পরিবেশে চলে যায় তখন দেখা যায় যে, সে তার জীবনকে সুন্দর রূপে গড়ে তোলার অধিকতর সুযোগ লাভ করে। আর এ দ্বিতীয় পরিবেশটি তার জন্যে অধিকতর উপযোগী হয় বিধায় সে অনায়াসেই সেখানে জীবনকে ভালো ভাবে গড়ে তুলতে পারে।

গ) বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনঃ অর্থোপার্জন ছাড়াও একজন লোক দেশ ভ্রমনের মাধ্যমে বেশি বেশি জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়ে থাকে। এটা সত্য কথা যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই একটা আলাদা জগত রয়েছে। আপনি যে শহরে বসবাস করছেন, হয়তো সে শহরে অনেক বিজ্ঞ আলেম রয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেক ফুলেরই একটি স্বতন্ত্র সুগন্ধ রয়েছে।

অন্য কোন শহরে বসবাসরত একজন আলেম হয়তো জ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনার শহরের একজন আলেমের সমান হবেনা, কিন্তু তার একটি আলাদা ভুবন তো রয়েছে। সুতরাং যখন আপনি সে জগতেও বিচরণ করবেন তখন আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে বৈকি। অন্য একটি জ্ঞান রাজ্যের সংগে আপনার নতুন করে পরিচয় ঘটবে। আর এভাবেই আপনার মধ্যে নতুন নতুন জ্ঞানের সঞ্চার হবে।

ঘ) শিষ্টাচার: শিষ্টাচার এবং ভদ্রতা-সভ্যতা এমন কোন জিনিস নয় যে, এর সব কিছুই ঘরে বসে অর্জিত হয়ে যাবে। কেননা, যদি কেউ এমন সব জিনিসের সংগে পরিচিত হয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন করে যা সে পূর্বে দেখেনি, তাহলে এদেশ ভ্রমন বা হিজরত তার অন্তরের মধ্যে একটি মজবুতি ও দৃঢ়তা আনয়ন করবে। অন্য কোন জিনিস তার মধ্যে এতোটা দৃঢ়তা আনয়ন করতে পারবে না। বই-পুস্তক এবং কিতাব-পত্র পড়েও এতোটা জ্ঞান অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

লোকেরা যদি ইসলামী দেশ সমূহ ভ্রমন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং বলে যে, সফরের পরিবর্তে বই পুস্তক অধ্যয়ন করাই শ্রেয় এবং এতেই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জিত হয়ে যাবে তাহলে এটা ঠিক হবেনা। কেননা, সফর বা দেশ ভ্রমনের মাধ্যমে যা অর্জিত হওয়া সম্ভব শুধু বই পুস্তকের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। তবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বই পুস্তক অধ্যয়ন খুবই ভালো কাজ। পুস্তকাদি অধ্যয়ন, গবেষণা এগুলো মানব জীবনের জন্যে নিতান্তই ফলপ্রসূ। কিন্তু বই পুস্তক অধ্যয়ন এক জিনিস এবং দেশ পরিভ্রমন অন্য জিনিস। এর প্রত্যেকটিই স্ব স্ব স্থানে সঠিক রয়েছে। আর অধ্যয়ন কখনো ভ্রমনের বিপরীত হতে পারেনা। দেশ ভ্রমনের মাধ্যমে পরিবর্তিত আবহাওয়া এবং নতুন নতুন পরিবেশের সুফল অনুভব করা যায়। শুধু তাই নয় এ দ্বারা মানুষের বসবাস, উঠাবসা ও

চালচলনের কিছু প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুস অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়ে থাকে। কেবল মাত্র বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে এগুলো অর্জন করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে এমন কতিপয় আয়াত রয়েছে যাতে দেশ ভ্রমনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন :

«قل سيروا في الأرض»

'হে, নবী বলো:তোমরা এই পৃথিবীতে ভ্রমন করো।'

«أو لم يسيروا في الأرض»،

অথবা'তারা কি এই পৃথিবীতে ভ্রমন করেনি।'

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ প্রায় একই মত পোষণ করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, এ দ্বারা ঐতিহাসিক অধ্যয়ন বুঝানো হয়েছে। তবে এ কথা সত্য যে, পবিত্র কুরআন ঐতিহাসিক অধ্যয়ন ও গবেষণাকে শুধু ঐতিহাসিক বই-পুস্তক অধ্যয়ন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখেনি। ইতিহাস অধ্যয়নের জন্যে ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী অধ্যয়নেরও আহ্বান জানানো হয়েছে। সুতরাং ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন যেরূপ উপকারী ও প্রয়োজন ঐতিহাসিক স্থান

এবং নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষন ও সফর অধিকতর প্রয়োজন। কেননা, দেশ ভ্রমনের কত গুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা রয়েছে। আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী(আঃ)এর প্রণীত দিওয়ানে উল্লেখিত হয়েছে :

تغرب عن الأوطان في طلب العلى وسافر في الاسفار خمس فوائد
تفرّج همّ، واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد

অর্থাৎ'উচ্চ মর্যাদা অন্বেষণার্থে দেশের বাইরে যাও। দেশ ভ্রমন করো, কেননা, দেশ ভ্রমনের মধ্যে পাঁচটি উপকারিতা রয়েছে। আর সে গুলো হচ্ছে এই : চিন্তা ভাবনার অবসান, অর্থোপার্জন, বিদ্যা বা জ্ঞান,

শিষ্টাচার এবং মহৎ লোকের সংস্পর্শ লাভ।'

অতএব, দেশ ভ্রমন করুন, পা বাধা পাখির মতো ঘরে বসে থাকবেন না। পাখির একটি পা'র সংগে যদি এক জোড়া জুতা বেধে দেয়া হয় তা হলে তা সে আদৌ নড়াচড়া করতে পারবেনা। দেশভ্রমন এজন্যেও প্রয়োজন যে, যখন কোন লোক স্বদেশ বহির্ভূত অন্য কোন দেশে ভ্রমন করে তাহলে সেখানকার চালচলন, আচার আচরণ, সভ্যতা ভদ্রতা প্রভৃতি নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে—যা স্বদেশে থেকে সম্ভব নয়। আর এমনটিও হয়ে থাকে যে, একটি ভিন্ন এলাকার লোকদের মধ্যে এমন সব অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে যা ভ্রমনকারীর নিজ এলাকার লোকদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আর সে এলাকার লোদের আচার আচরণ ও শিষ্টাচার ভ্রমনকারী বা ভ্রমনকারীদের এলাকার লোকদের আচার আচরণ ও শিষ্টাচার থেকে উৎকৃষ্টতরও তো হতে পারে।

এ ছাড়া এটাও তো হতে পারে যে, পর্যটক বা ভ্রমনকারী তার এই সফর উপলক্ষে এমন অনেক নতুন নতুন সভ্যতা ও শিষ্টাচারের সংগে পরিচিত হতে পারে, যাকে সে গুলোকে নিজের জীবনে কার্যকরী করতে। সুতরাং আপনাদের উচিত দেশ ভ্রমনে বের হওয়া, এবং এসব শিষ্টাচারকে স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করা। অন্তত পক্ষে এতটুকু তো সম্ভব হতে পারে যে, যখন আপনি অন্য কোন দেশ বা এলাকার আদব কায়দা বা শিষ্টাচার প্রত্যক্ষ করবেন এবং আপনার নিজ দেশের শিষ্টাচার সমূহও আপনার জানা আছে, তখন আপনি নিশ্চয়ই এতদুভয়ের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন। আর এভাবেই আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন যে, কোন প্রকারের শিষ্টাচার গুলো উত্তম, তা হলে সে গুলো আপনি গ্রহণ করতে পারবেন এবং কোন প্রকারের শিষ্টাচার গুলো সঠিক নয় তাহলে সে গুলো আপনি ছেড়ে দিতে পারবেন।

৬) মহৎ লোকের সংগ লাভ : দেশ ভ্রমনের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন ছাড়াও আরো একটি জিনিস অর্জিত হয়ে থাকে। আর তা হচ্ছে মহৎ লোকদের সংসর্গ। মোটকথা, দেশ ভ্রমনের মাধ্যমে আপনি অনেক মহৎপ্রাণ ব্যক্তির সংগে একত্রে থাকা ও উঠা বসার সুযোগ পেতে পারেন। আর এমনও হতে পারে যে, এসব লোকের সংস্পর্শে থাকার ফলে আপনি এমন সব জিনিসের সন্ধান পেয়ে যাবেন যা আপনাকে মর্যাদা ও সাফল্যের শীর্ষদেশে পৌঁছে দিবে।

উচ্চ মর্যাদা অন্বেষণ :

এখানে উচ্চ মর্যাদা অন্বেষণ করার কথা বলা হয়েছে। এ দ্বারা আমরা কি বুঝতে পারি? আর এর অর্থ এই নয় যে, কারো দেশ ভ্রমন বা সফরের উদ্দেশ্য হবে সুস্বাদু এবং ভালো ভালো খাদ্য কোথায় পাওয়া যায় তার সন্ধান করা এবং কোথায় রাজকীয় হোটেল ও উন্নত মানের আবাসিক ভবন সমূহ রয়েছে তার প্রতি তাকিয়ে থাকা। বরং এখানে এ কথাটিই ব্যক্ত হয়েছে যে, জীবনের বৈশিষ্ট্য, উচ্চ মর্যাদা এবং অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে দেশের বাইরে গমন করো। আর স্বদেশ ভূমির বাইরে সফরের মাধ্যমেই এ সব সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে।

ইতিহাস বলে, যে সব শিক্ষাবিদ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিদেশ ভ্রমনে বের হয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশ পর্যটন শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন তাদের মধ্যে একটি বিশেষ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আলেমদের মধ্যে শেখ বাহাইর নাম এ প্রসংগে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

কবিদের মধ্যে শেখ মুসলেহ উদ্দীন সাদী এমন একজন ব্যক্তিত্ব

ছিলেন যার মধ্যে সব ধরণের গুণের সমাহার ছিল। তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিভংগিকে সামনে রেখে কাব্য চর্চা করেছেন। সাদীর কাব্যের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি উদ্দীপনা মূলক কবিতা, গজল, আধ্যাত্মিক গজল, নীতিকথা ও উপদেশ মূলক কবিতা প্রভৃতি রচনা করেছেন। কোন এক বিষয়েই তার কাব্য সাধনা সীমাবদ্ধ নেই, বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তার কাব্য ভান্ডার ছড়িয়ে রয়েছে। শেখ সাদী এমন একজন কবি ছিলেন যিনি ত্রিশটি বছরই দেশভ্রমনে ব্যয় করেছেন।

তিনি নব্বুই বছর বেচে ছিলেন। ত্রিশবছর বিদ্যা শিক্ষা অর্জনে ব্যয় করেছেন, ত্রিশ বছর কাটিয়ে ছিলেন দেশ ভ্রমনে এবং অবশিষ্ট ত্রিশ বছর কাটিয়ে ছিলেন জ্ঞান গবেষণা ও আধ্যাত্মিক সাধনায়। শেষোক্ত ত্রিশ বছরে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অমর কাব্য গ্রন্থ 'গুলিস্তান' ও 'বুস্তান' অভিজ্ঞতা লব্ধ এই শেষোক্ত জীবনেই রচিত হয়। আর একারণেই তুলনামূলক ভাবে তিনি একজন শক্তিশালী এবং পূর্ণাংগ জ্ঞানের অধিকারী কবি ছিলেন।

তাঁর 'বুস্তান' কাব্য গ্রন্থে রয়েছে :

در اقصای عالم بگشتم بسی — بسر بردم ایام با هر کسی
بهر گوشه ای توشه ای یافتم — ز هر خرمنی خوشه ای یافتم

আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছি। সকলের সংগেই মেলা মেশা করেছি। এবং জীবনের অনেক দিন তাদের সংগে কাটিয়েছি। প্রত্যেক অঞ্চল থেকেই কিছু না কিছু অর্জন করেছি। আর প্রতিটি সজীব ও তর তাজা বৃক্ষ থেকেই থোকা থোকা ফল আহরণ করেছি।'

গুলিস্তান ও বুস্তান কাব্য গ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনী ও গল্পে রয়েছে—একদিন বায়ালা বাক্কার জামে মসজিদে ছিলাম, তখন একটি ঘটনা ঘটেছিল। অন্য এক জায়গায় বলেন—একদিন কাশমারে ছিলাম, তখন এটা হয়েছিল। কোথায় 'বায়ালা বাক্কা' আর কোথায়

কাশমীর?' কাশমীরে একটি বালকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এসময় সে নাহু (আরবী ব্যাকরণ) পড়ছিলো। আমি তাকে বললাম :

طبع ترا تا هوس نحو شد ٭ صورت یکی از دل ما محو شد

অর্থাৎ' নাহু পড়ার মধ্যে যখন তোমার অন্তর নিবিষ্ট হয়ে গেলো, তখন আমার অন্তরে যে ছবিটি ধারণ করেছিলাম তা অন্তর্হিত হয়ে গেলো। অর্থাৎ তোমার নাহু পড়া দেখে আমি তার কথা ভুলে গেলাম।'

তিনি কখনো বলেছেন যে, একদা ভারতের সোমনাথে ছিলাম, তখন এটা ঘটেছিল, ওটা ঘটেছিল। এটা দেখেছি, ওটা দেখেছি। এক সময় হেজাজ ভ্রমনে গিয়েছিলাম—তখন এক ব্যক্তি আমার সংগে ছিল। সে এ কাজ করলো, ঐ কাজ করলো। মনে হয় যেন তিনি সব কিছুই বর্ণনা করেছেন কিছুই বাকি রাখেন নি। আর সত্য কথা বলতে কি কবিদের আত্মা মূলতঃ এ ধরনের সফর ও অভিজ্ঞতার দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে থাকে। আর এ কারনেই আপনারা শেখ সাদীর কাব্যের মধ্যে বলিষ্ঠতা দেখতে পাচ্ছেন।

হাঁ, মাওলানা রুমীর কাব্যেও এ ধরনের অভিজ্ঞতার ফসল বর্তমান রয়েছে। কারণ, তিনি ব্যাপক ভাবে দেশভ্রমন করেছেন। অনেক জাতি ও সম্প্রদায়ের সংগে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। আর তিনি তাদের ভাষাও আয়ত্ব করেছিলেন। তিনি তাদের ভাষা তথা শব্দ সমূহ নির্দ্বিধায় তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সংগে পরিচিত ছিলেন।

কবি হাফিজের উপর আমাদের গভীর আস্থা রয়েছে। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক কবি। আধ্যাত্মিক গজলের বিচারে সাদী তার সমকক্ষ হতে পারেন নি। এই ব্যাপারে কবি হাফিজের জ্ঞান ছিল খুবই ব্যাপক। তবে তা শুধু একতরফা—তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। তিনি জীবন ভর শিরাজ নগরীর সংগে তাঁর অন্তরকে বেধে রেখে

ছিলেন। তিনি বলেছেন :

اگرچہ اصفہان آب حیات است ولی شیراز ما از اصفہان بہ

'যদিও ইস্পাহান হচ্ছে সঞ্জিবনী সুধা, কিন্তু আমাদের শিরাজ হচ্ছে ইস্পাহানের তুলনায় সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।'

خوشا شیراز و وصف بی مثالش خداوندا نگہدار از زوالش

'শিরাজ নগরী তুলনাহীন, তার প্রশংসা আর কত করবো। হে, খোদা! যে কোন ধরনের পতন থেকে একে রক্ষা করো।'

তিনি সব সময়ই এই সবুজ শ্যামল ও সুখময় স্থান তথা তাঁর স্থায়ী বাসস্থানের সংগে নিজের অন্তরকে বেঁধে রেখেছিলেন। জানা যায় তিনি একবার ভ্রমনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। কিন্তু 'শিরাজ' থেকে 'ইয়াজদ' পর্যন্ত পৌঁছেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর প্রিয় 'শিরাজ' নগরীকে বার বার স্মরণ করেন এবং বলেন :

اے خوش آنروز کزین منزل ویران بروم
راحت جان طلبم وز پی جانان بروم
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت
رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

'সেই সৌভাগ্যপূর্ণ দিনগুলো কখন ফিরে আসবে যখন আমি এই বিরান ভূমি থেকে প্রত্যাবর্তন করতে পারব? কখন সে দুঃখ বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং প্রিয়তমার সাক্ষাৎ লাভ হবে? আলেকজান্ডারের জেলখানার আতংকে আমার অন্তর সংকীর্ণ ও আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কখন সফরের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহন করবো এবং সুলাইমান নগরীতে প্রত্যাবর্তন করবো?'

কবি রচিত এই কবিতা গুলোয় আধ্যাত্মিকতা চিন্তা করলে কবির অন্তরের গভীর অনুধ্যান কি তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এখানে উল্লেখিত দ্বিতীয় শ্লোকটির ব্যাখ্যা হচ্ছে এই : ইতিহাস এবং প্রাচীন উপাখ্যান সমূহে লিপিবদ্ধ আছে যে, আলেকজান্ডার যখন ইরানে পদার্পণ করেন তখন তিনি ইয়াজ নগরীতে তাঁর জেলখানা স্থাপন করেন। অর্থাৎ যখনই কাউকে গ্রেফতার করা হতো তখন তাকে 'ইয়াজদ' এর কয়েদ খানায় প্রেরণ করা হতো। অন্য দিকে সে সুপ্রাচীন কাল থেকেই ' শিরাজ' এবং 'তখতে জামশিদ' সুলাইমান নগরী' বলে খ্যাত হয়েছে।

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت
رخت بربندم و ملک سلیمان بروم

এ আলোচ্য শ্লোকটির যদি আধ্যাত্মিক তথা অন্তর্নিহিত অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে আলেকজান্ডারের জিন্দান খানা দ্বারা এই দুঃখ কষ্টময় পার্থিব জীবনকেই বুঝতে হবে, আর 'মুলকে সুলাইমান' এর অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য এবং আধ্যাত্মিক জগত।

কিন্তু এই পংক্তি দুটি রচনার পর তিনি ভাবলেন যে, ইয়াজদের অধিবাসীরা হয়তো এতে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। কারন, এতে ইয়াজদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে। তাই তিনি ইয়াজদের অধিবাসীদের গুণ কীর্তন করে আরেকটি শ্লোক রচনা করেন—যাতে ইয়াজদের অধিবাসীগণ খুশি হয়ে যান। তিনি বলেন :

ای صبا از ما بگو به ساکنان شهر یزد
ای سرما حق شناسان گوی چوگان شما

'হে, ভোরের সমীরণ আমাদের কাছ থেকে ইয়াজদ বাসীদের নিকটে এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও যে, —হে, ইয়াজদের লোকেরা, স্মরণ রেখো। আমরা তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাদের গুণগ্রাহীদের শির

তোমাদের ব্যাটের বলের সমতুল্য।' (অর্থাৎ কবি এখানে ইয়াজিদবাসীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ)।

সে যাই হোক, তিনি একবার ভারত সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু সমুদ্র তীরে পৌঁছার পর বলেন : আমাকে ফিরে যেতে দাও। আমি সমুদ্রের অধিবাসী নই। এর পর আরেকবারও ভারত সফরের ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু সমুদ্র তীরে পৌঁছার পর শিরাজে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি শিরাজ নগরীর পুষ্পকুঞ্জের সংগে নিজের অন্তরকে নিবিড় ভাবে বেঁধে রাখেন। তা ত্যাগ করে কোথাও বের হতে তার মন চায় নি।

শেখ বাহাই যিনি গোটা বিশ্ব পরিভ্রমন করেছিলেন এবং একজন আলেম যিনি পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত নজফের দরওয়াজার বাইরে কোথাও বের হননি—এই দু'জনের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রয়েছে। কেননা, শেখ বাহাই হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার সংগে পৃথিবীর অনেক দেশের বিপুল সংখ্যক লোকের পরিচয় রয়েছে। আমাদের আরো অনেক আলেমই এই রূপ ছিলেন। ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো যে, যে সব আলেম জীবনে ব্যাপক ভাবে সফর করেছেন এবং এ ভ্রমন সূত্রে বিভিন্ন লোক ও জাতির সংগে মেলা মেশার সুযোগ পেয়েছেন এবং বিভিন্ন যোগ্য শিক্ষক থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সুবিধা লাভ করেছেন তাদের চিন্তা শক্তি ও জ্ঞানের গভীরতা সে সব লোকের চেয়ে অনেক অনেক বেশি—যারা শিক্ষা দীক্ষায় তাদের চেয়ে আদৌ কম ছিলেন না। এটা এই জন্যে যে, এই শেষোক্ত লোকেরা তাদের বাসস্থানের বাইরে কখনো পা রাখেননি। সুতরাং আত্মার মজবুতি ও সবলতার বিচারে তাদের ও এদের মধ্যে আসমান জমিন পার্থক্য রয়েছে।

বিভিন্ন হাদীসে হিজরতের একটি তাত্ত্বিক বা গূঢ় ব্যাখ্যা দেয়া

হয়েছে। আর তা হচ্ছে : «المهاجر من هجر السيئات» অর্থাৎ 'মুহাজির তাকেই বলা যেতে পারে, যে অন্যায় বা মন্দ কাজ সমূহ পরিত্যাগ করেছে।' এ ব্যাখ্যা থেকে কারো মধ্যে এ রূপ চিন্তা আসা উচিত হবে না যে, এবওস্থা দ্বারা বাহ্যিক ও শরীরে হিজরত কে অস্বীকার করা হয়েছে। বরং একথা দ্বারা আধ্যাত্মিক এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও হিজরতের মাহাত্ম প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু তাকেই হিজরত বলা হয় না যে—কোন লোক স্বীয় শহর, ঘর বাড়ী এবং এলাকা ছেড়ে চলে যাবে। অর্থাৎ একই অঞ্চলে বা একই শহর অথবা গ্রামে কুড়ে হয়ে বসে না থাকা অথবা যে আলো বাতাসে সে লালিত পালিত হয়েছে সেখানে বন্দী হয়ে না থাকার নামই শুধু হিজরত নয়। অবশ্য এটা এক ধরণের স্বাধীনতা এবং সকল প্রকার বন্দীত্বের পরিপন্থী। আর ঠিক অনুরূপ ভাবেই মানুষের উচিত নয় কোন বিশেষ অভ্যাস বা স্বভাবের দ্বারা বন্দী হয়ে যাওয়া। শুধু তাই নয়, যে রূহানী এলাকা বা পরিবেশে সে জীবন যাপন করছে কেবল সেখানেই আবদ্ধ হয়ে থাকা তার উচিত নয়।

অধিকন্তু মানুষ এমন সব জিনিসের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে পড়ে—সামাজিক ভাবেও যার একটি প্রভাব পড়ে যায় এবং শারীরিক ও মানসিক দিক থেকেও এই অভ্যাসটি একটি স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ ধূমপানের কথা বলা যেতে পারে। এ এমন একটি অভ্যাস যে, এমন অনেক লোক আছেন, যদি ডাক্তারও পরামর্শ দেন যে, ধূমপান ত্যাগ করতে হবে, তখন তারা বলেন যে, তা কি করে হয়? এটাতো আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। কাজেই এ অভ্যাস ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আর ধূমপান ত্যাগ করলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়বো। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এসব হচ্ছে অর্থহীন বাহুল্য কথাবার্তা। 'সেই প্রকৃত মুহাজির যে, সমস্ত মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ করতে পেরেছে।' মোট কথা সে-ই মানুষ নামের

পদবাচ্য হতে পারে যে যাবতীয় বদ অভ্যাস ছেড়ে দিতে সক্ষম। সুতরাং যে লোক ধূমপানের মতো একটি বদ অভ্যাসকে পরিত্যাগ করতে পারে সে আবার কেমন মানুষ?

মরহুম আয়াতুল্লাহ হুজ্জাত অত্যধিক ধূমপায়ী ছিলেন। তাঁর মতো ধূমপায়ী ব্যক্তি আমি আজ পর্যন্ত আর কাউকে দেখিনি। তার মুখে সব সময়ই সিগারেট থাকতো। নিদ্রার সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকী সময়ের অধিকাংশই তিনি ধূমপানের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত করতেন।

একবার তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসার জন্যে তাকে তেহরানে আনয়ন করা হয়। ডাক্তারগণ পরীক্ষা করে দেখার পর বলেন : যেহেতু আপনি ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত, কাজেই আপনাকে ধূমপান ত্যাগ করতে হবে। প্রথমতঃ তিনি উপহাস ছলে বললেন : আমার এই বুক তো সিগারেট পান করার জন্যেই। আর যদি সিগারেটই পান করতে না পারি, তাহলে এই বুক দিয়ে কি করবো? কিন্তু ডাক্তারগণ বললেন যে, সে যাই হোক আপনাকে ধূমপান ত্যাগ করতেই হবে। কেননা, এটা আপনার জন্যে ভীষণ ক্ষতিকর। তিনি বলেন : 'সত্যিই কি ক্ষতিকর? তারা বললেন : জী, হ্যা। 'ঠিক আছে তাহলে আমি আর সিগারেট পান করবো না।' এরপর তিনি ধূমপান ত্যাগ করেন। কথার সংগে সংগেই সিধান্ত গ্রহণ। এধরনের লোককেই অভ্যাসের মুহাজির বা অভ্যাস পরিত্যাগকারী বলা হয়ে থাকে।

কথিত আছে যে, মামুনের মাটি খাওয়ার অভ্যাস ছিলো। সে সব সময়ই মাটি খেতো। তার চিকিৎসার জন্যে দেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকদেরকে ডাকা হলো। কিন্তু কোন কাজই হলোনা। একেকজন একেক ধরণের ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই কার্যকরী হলোনা। এ জন্যে মজলিস ডাকা হলো। মজলিসের এক প্রান্তে দরওয়াজায় একজন দরবেশ দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন : এর চিকিৎসা আমার কাছে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো সেটা কি?

তিনি বললেন :'এক শাহী সিদ্ধান্ত। 'এ কথা শুনে মামুনের অন্তরে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। সে বললো :' হাঁ দরবেশ ঠিকই বলেছেন। 'অতঃপর মামুন আর কখনো মুখে মাটি নেয়নি।

কোন মানুষকেই এ ধরনের অভ্যাসের বন্দী হওয়া উচিত নয়। কিন্তু অতীব দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যেই এ ধরনের অভ্যাস বেশি বেশি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তাদের সামাজিক অভ্যাস সমূহের মধ্যে একটি অভ্যাস হচ্ছে এই যে, তারা মৃত ব্যক্তির তৃতীয় এবং সপ্তম দিনে কিছু রসম পালন করে থাকেন এবং চল্লিশতম দিবসেও কিছু রসম রেওয়াজ পালন করেন। এছাড়া বিয়ে-শাদী উপলক্ষেও তারা কিছু প্রথা পালন করে থাকেন। যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এগুলো কি এবং কি জন্যে? তখন তারা বলেন : এগুলো তো হচ্ছে রসম রেওয়াজ বা সামাজিক প্রথা। কি করা যাবে এগুলো কি পালন না করে উপায় আছে? যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এগুলো পালন করার মধ্যে এমন কি দার্শনিক তত্ত্ব রয়েছে? তখন তারা বলেন:'এর আবার দার্শনিক তত্ত্ব কি? এটা তো শুধু সামাজিক প্রথা। আর এগুলো পালন না করে কি কোন উপায় আছে?'এটাকেই বলে বন্দীত্ব। এটাকেই বলে অন্ধ অনুসরন, মানবতার অবমাননা এবং অসহায়ত্ব। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সামাজিক প্রথার মধ্যে বন্দী হয়ে জীবন যাপন করা কোন মনুষেরই উচিত নয়। বরং সকল স্তরের মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কেবল মাত্র যুক্তি পূর্ণ বিষয়গুলোই অবলম্বন ও অনুসরণ করা।

অপর দিকে বর্তমান যুগের তথাকথিত চিন্তাশীল আধুনিক লোকদের মতোও হওয়া উচিত নয়—যারা সকল প্রকার সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথার ঘোর বিরোধী। আমাদের কথা হলো এই যে, সব ধরনের সামাজিক প্রথার বিরোধী হওয়া উচিত নয়। একজন লোকের কর্তব্য হচ্ছে যুক্তিপূর্ণ সকল কথাই মেনে নেয়া এবং যা কিছু

অযৌক্তিক ও অসংগত কেবল তারই বিরোধিতা করা।

আমরা সকলেই অবগত আছি যে, ইসলাম মানব জীবনে হিজরতের বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাহলে এর অর্থ কি দাড়ালো? এর অর্থ হচ্ছে এই যে, এর মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বকে সজিবীত রাখতে হবে এবং তার প্রতিপালন করতে হবে। আর সে সব জিনিসের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে যা মানুষকে বিভিন্ন ভাবে বন্দী করে রেখেছে।

হে, মানুষ। তুমি যে পরিবেশে জন্ম লাভ করেছো সেখানেই বন্দী হয়ে থেকোনা, নিজেকে একটি সংকীর্ণ কুঠরীতে আবদ্ধ করে রেখোনা। [১]

মানুষের এতটুকু চিন্তা ও মতামত গ্রহনের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন যাতে সে কোন বিশেষ এলাকা, দেশ অথবা পরিবেশের দ্বারা বন্দী হয়ে নাপড়ে। এছাড়া তার এতটুকু ইখতিয়ারও থাকা প্রয়োজন যে, পরিবেশ তার উপর যে সব ভ্রান্ত অভ্যাস ও মন্দ স্বভাব চাপিয়ে দিয়েছে সে যেন তা থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। মোটকথা, মুহাজির কেবলমাত্র তাকেই বলা যেতে পারে যিনি সকল প্রকার মন্দ কাজ ও বিভ্রান্তি থেকে দূরে অবস্থান করছেন। এভাবে হিজরত হচ্ছে সে সব মন্দ কাজ ও পরিবেশ থেকে দূরে অবস্থান করারই নাম—যা মানুষকে ঘেরাও করে রেখেছে।

জিহাদ

জিহাদের অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ করা। জিহাদের এ ব্যাখ্যা তার অনুর্নিহিত এবং আধ্যাত্মিক অর্থে তথা স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ অর্থেও প্রযোজ্য। যে ভাবে কোন মানুষকে পরিবেশের অধীন বন্দী হয়ে থাকা উচিত নয়, ঠিক তেমনি ভাবেই কোন পরিবেশের প্রতিবন্ধকতারও বন্দী হওয়া উচিত নয়।

অর্থাৎ হে, আদম সন্তান, তোমাকে সৃষ্টিকরার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, পরিবেশের যে প্রতিবন্ধকতা তোমার অনুর্নিহিত ও আধ্যাত্মিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক, সে গুলো দূর করে নিজেকে উন্নতির শীর্ষ দেশে পৌঁছাবার চেষ্টা করো। 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে হিজরতের জন্যে নিজ গৃহ থেকে বের হয়, ...' এ আয়াতটির পূর্বে নিম্নোক্ত এ আয়াতটি রয়েছে :

«ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيراً وسعة »

অর্থাৎ হিজরত করো এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন স্থানে

হিজরত করবে সে অনেক সুন্দর স্থান এবং প্রশস্ত জমিন লাভ করতে পারবে।'[১০]

এখানে কুরআন মজিদের একটি সুন্দর বিশ্লেষণ রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, —'এবং যারা আল্লাহর পথে হিজরত করে'—এই আয়াতটির পূর্বে নিঃস্ব ও বঞ্চিত লোকদের সাথে সম্পর্কিত নিম্নোক্ত এই আয়াতটি রয়েছে :

«ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها»

'যারা নিজেদের উপর অবিচার করে, তাদের প্রাণ হরনের সময় ফিরেশতাগণ বলে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।' তারা বলে, তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর দুনিয়া কি এখন প্রশস্ত ছিলনা? ' (সুরা নিসা : ৯৭)

অর্থাৎ ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদের প্রেক্ষিতে তারা অর্থহীন জবাব প্রদান করে থাকে। তখন ফেরেশতারা বলেন যে,—এটা কোন যুক্তি যুক্ত কারণ হতে পারেনা। এধরণের জবাব শুধু বুক লড়াই দিতে পারে যে গুলো স্বীয় স্থান থেকে নড়াচড়া করতে পারেনা। যদি এদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমরা সড়কের পাশে দাড়িয়ে থেকে

এতো বিবর্ণ হয়ে গেছো কেন? তোমাদের পত্র পল্লবগুলো আফিমখোরদের মতো এতো কালো হয়ে গেছে কেন? তখন এ গুলো জবাব দিবে : তোমরা কি দেখছো না যে, সিনি বাসের ধোয়ায় আমাদের এ অবস্থা হয়ে গেছে। এতে আমাদের কি ত্রুটি আছে? হাঁ, এতে বৃক্ষ লতার কোন ত্রুটি থাকতে পারেনা। প্রকৃত পক্ষে এদের এমন কোন শক্তি সামর্থ্যনেই যে, এ গুলো স্ব স্ব স্থান থেকে উঠে গিয়ে কোন বন জংগল অথবা খোলা ময়দানে চলে যেতে পারে—যাতে সেখানে তাদের পাতা গুলো সবুজ ও তর তাজা থাকে।

এ সব বৃক্ষলতার শিকড় গুলো জমিনে প্রোথিত। কাজেই এগুলো কোন অবস্থায়ই অন্যত্র বিচরণ করতে পারে না। অপর দিকে এমন কি পশু পক্ষী পর্যন্ত এরূপ উক্তি করতে পারেনা।

জন্তু জানোয়ারদের মধ্যেও অনেকেই স্থান পরিবর্তন করে থাকে। কবুতরও দেশত্যাগী হয়ে থাকে। আবাবিল এবং আরো কিছু সংখ্যক পাখি রয়েছে যে গুলো হিজরত তথা একস্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে চলে যায়। এমন কি সমুদ্রের মাছও এই রূপ স্থান পরিবর্তন করে। এরা শীত এবং গরম মৌসুমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। যেমন আবাবিল পাখী গরম কালে অপেক্ষাকৃত শীতল ও ঠান্ডা স্থানে চলে যায় এবং এ জন্যে শত শত মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে থাকে। কিছু এমন ধরনের মৎস রয়েছে যে গুলো সমুদ্রের এক অংশ থেকে অন্য অংশে চলে যায়—অতঃপর স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করে। এত দিবে ফড়িংও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায়।

স্মর্তব্য যে, যখন জন্তু জানোয়ার নিজের অনুরকে মাটি এবং প্রস্তর খন্ডের সংগে জড়িয়ে রাখে না তখন মানুষ কি করে এই রূপ বাহানা সৃষ্টি করছে। যখন তাদের কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় কেন? তোমরা এ ধরনের অপবিত্র

কেন? তখন তারা জবাব দিবে যে, পরিবেশের কারণে—পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ ছিল। তারা বলবে —এসব সিনেমা, বিচিত্র বেশধারিনী ডানা-কাটা মহিলা, মদ্য শালা সমূহ—এটা ওটা এসব কিছুই পরিবেশের দান, আর এসব পরিবেশই আমাদেরকে পাপ কর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করছে।

কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, এসব কিছুই হচ্ছে অনর্থক কথাবার্তা। তারা কি এ পরিবেশ থেকে বের হয়ে অন্য কোন পরিচ্ছন্ন ও অনুকূল পরিবেশে যেতে পারতো না? ফিরেশতা গণ তাদের জবাবে একথাই বলবেন। এ ধরনের লোকদের বলা হবে যে, আল্লাহর রাজ্য কি প্রশস্ত ছিল না? কাজেই তোমরা হিজরত করে সেখানে যেতে পারতে। তখন তারা উত্তর দিবে : 'আমরা তো দুর্বল ও অসহায় ছিলাম।' তারা আরো বলবে : আমরা তো অবশ্যই মুসলমান ছিলাম। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মান্য করতাম। কিন্তু আমরা অন্যদের অধীন ছিলাম। আর আমাদের শত্রুগণ সব সময়ই আমাদেরকে অবদমিত করে রাখতো। আর এ ধরনের লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহতায়ালার এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে :

«ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة»

'যারা আল্লাহর পথে হিজরত করবে তারা অনেক সুন্দর ও প্রশস্ত স্থান লাভ করবে।' অর্থাৎ সেখানে দুশমনের কোন হস্তক্ষেপ ও হামলা চলবে না। দুশমন যদি একবার তাদের অপদস্থ করতে এগিয়ে আসে তাহলে তারাও তার প্রতিশোধ নিতে পারবে। তাদেরকেও অনুরূপ ভাবে অপদস্থ ও পর্যুদস্থ করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ করেই তাদেরকে টিকে থাকতে হবে।

«ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته

مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله»[১]

এ আয়াতের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যার তাৎপর্য অনুরূপই। এ কথা সত্য যে, কিছু সংখ্যক লোক মিথ্যা বলাকে তাদের অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। যখন তাদের কে বলা হয় যে, মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো, তখন তারা বলে থাকে যে, এটাও কি সম্ভব? মানুষ কি মিথ্যা না বলে থাকতে পারে? মানুষের তো মিথ্যা না বলে উপায় থাকে না।

যদি বলা হয় যে, মাহরাম মহিলাদের দিকে তাকাবে না, তখন তারা বলে যে, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, মানুষ মহিলাদের প্রতি তাকাবে না?

আমি বক্তৃতা প্রসংগে একবার বলেছিলাম যে, ওমর খৈয়ামের কবিতার এই পঙক্তি[২] দু'টি মানবতা ও আমাদের শিল্প সাহিত্যের জন্যে অবমাননাকর। পঙক্তি[২] দুটি হচ্ছে :

یارب تو جمال آن مه مهر انگیز آراسته ای به سنبل عنبر بیز
پس حکم همی کنی که در وی منگر این حکم چنین بود که بگذارد مریز

'হে, খোদা! তুমি এমন সুন্দর সৃষ্টির পর আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছো যে, আমরা যেন চক্ষু উন্মিলিত করে সে দিকে না তাকাই। তোমার এ নির্দেশের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, বরতন কে তো কাত করে রাখা হবে অথচ বলা হবে, তার ভেতরের জিনিস যেন পড়ে না যায়।'

পরিবেশের কারনে আমরা এরূপ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কাজেই কি করা যাবে? 'না, না, তুমি বাধ্য ছিলেনা। তুমি মনুষ্যত্বের অবমাননা করেছো।

যদি কাউকে বলা হয় যে, নামাজে নিজের ধ্যানকে সব সময় উপস্থিত রাখবে। তখন সে বলে যে, না এটাতো কিছুতেই সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়? যদি এটা অসম্ভবই হতো তাহলে এই ব্যাপারে কেন বলা হয়েছে? নিশ্চয়ই তা সম্ভব, তবে তোমার মধ্যে সে আত্ম-নিয়ন্ত্রন ও মনোযোগের অভাব রয়েছে। তোমার মধ্যে মনোযোগ থাকলে তোমার ধ্যানও হাজির থাকবে। মনোনিবেশ সহকারে নামাজে দাড়ালে তোমার সকল ধ্যান ও খেয়াল তোমার ইখতিয়ারাধীন থাকবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনোযোগ বলতে আমরা কি বুঝি? মনোযোগ হচ্ছে অন্তরের চিন্তা ভাবনারই ফলশ্রুতি। আর এ চিন্তা ভাবনা কখনো তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার মধ্যে আসতে পারেনা। কবি বলেছেন :

حاکم اندیشہ ام محکوم نی چوں کہ بنا حاکم آمد بر گل ای
جملہ خلقان سخرۂ اندیشہ اند زیں سبب خستہ دل و غم پیشہ اند

'(সুখের বিষয় যে,) আমরা আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছি, আমরা চিন্তা-ভাবনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নই। অথচ এমন অনেক লোক আছে যারা তাদের চিন্তা-ভাবনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং তারা সব সময়ই এক ধরনের পেরেশানী ও দুশ্চিন্তার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে।'

সে যাই হোক, মানুষ কেন অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আল্লাহতায়ালাতো মানুষকে কারো অধীন বানায়নি। আল্লাহতায়ালা মানব জাতিকে এতোটা স্বাধীনতা দিয়েছেন যাতে সে নিজেকে সব কিছু থেকে আজাদ রাখতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয় স্বাধীনতার সংগে সংগে সে যেন প্রত্যেক জিনিসের উপর প্রভাব প্রতিপত্তিও রাখতে পারে। তবে এ জন্যে অত্যধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন—প্রয়োজন অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনার। এ ছাড়া এ জন্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হবে।

মানুষকে সব সময়ই তার নিজের সংগে যুদ্ধ করতে হয়, নিজের প্রবৃত্তি ও রিপু সমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়, ভোগ লালসার বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করতে হয়, তার সাথে-সরঞ্জাম ও বিত্ত সম্পদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় এবং যুদ্ধ করতে হয় তার আয়েশের বিরুদ্ধে। যদি এতটুকু সংগ্রাম করতে সে সক্ষম না হয় তা হলে সে স্বাভাবিক ভাবেই এ সবের নিয়ন্ত্রনের অধীনে চলে যাবে। আল্লাহতায়ালা মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন। কাজেই তাকে দুটি পথের কোন একটিকে অবলম্বন করতে হবে। হয় নফসে আম্মারার(কু প্রবৃত্তির) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে একে নিজের অনুগত করতে হবে অথবা আরাম আয়েশের অতল-গহ্বরে নিজেকে নিমজ্জিত করে দিতে হবে। আল্লামা ইকবালের ভাষায় :

دل کی آزادی شہنشاہی شکم ساماں موت فیصلہ تیرا ترے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم

'অর্থাৎ দিল বা অন্তরের আজাদী হচ্ছে শাহানশাহী, আর পেটের বান্দা ও ফকির হচ্ছে মৃত্যু তুল্য। তোমার সিদ্ধান্ত তোমার কাছেই - দিল অথবা পেট। তুমি যেটা চাও সেটাই হবে(অনুবাদক)।

নফসে আম্মারা বা কু প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যদি কেউ তাকে নিজের অধীনস্থ করতে না পারে তাহলে সেই তাকে অধীন করে নিবে। কেউ যদি তার উপর জয়ী হতে না পারে তবে সেই তার উপর জয়ী হবে।

হযরত আলী(আঃ)এর তাকওয়া বা খোদা ভীরুতার কি দর্শন ছিল? তার দুনিয়া ত্যাগেরই বা কি দর্শন ছিল? প্রকৃত পক্ষে আজাদী বলতে তিনি বুঝেছিলেন অন্তর ও দিলের আজাদী। তিনি কখনো কোন জিনিসের নিকট নিজেকে বিকিয়ে দেননি, পরাজিত হননি। তিনি যে ভাবে আমর ইবনে আবদে উদ এবং মারহাবের মতো ব্যক্তিদের হাতে পরাজিত হতে চাননি, তেমনি ভাবেই অপছন্দ করতেন প্রবৃত্তির ইচ্ছার নিকটে নতি স্বীকার করতে।

কথিত আছে একদিন হযরত আলী(আঃ)এক কসাইর দোকানের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন(তাঁর খেলাফতের সময়)। কসাই তাকে দেখে

বললো: 'হে, আমিরুল মুমেনীন! আজ খুব ভালো গোশ্ত আছে। আপনি ইচ্ছা করলে নিতে পারেন।' তিনি বললেন: 'না, আজ আমার হাতে পয়সা নেই।' কসাই বললো: অসুবিধে নেই আপনি পরেই এর মূল্য পরিশোধ করুন। ইমাম বললেন: আমি আমার পেটকে কিছু দিন ধৈর্য ধারণ করতে বলবো। পেটকে মানিয়ে নিতে না পারলে তোমার কাছ থেকে বাকীতে এন্ম করতাম। আর যেহেতু আমি আমার পেটকে মানিয়ে নিতে পারছি, তাই তোমার নিকট থেকে বাকীতে গোশ্ত এন্ম করতে ইচ্ছুক নই। শেখ সাদী (রহ) এই বিষয়টিই তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমিরুল মুমিনীন আলী (আঃ) বলেন: 'আমি ভালো ভাবেই জানি যে, কি ভাবে উপাদেয় এবং সুস্বাদু খাবার খেতে হয় এবং কি ভাবে সুন্দর সুন্দর পোষাক পরিধান করতে হয়। আর এ সব কিছুই আমি করতে পারি, কিন্তু আমি নিজেকে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা দ্বারা বন্দী করতে চাই না—তাই।' অতঃপর তিনি এই নশ্বর পৃথিবীকে সম্বোধন করে বলেন:

«اليك عني يا دنيا، فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك وأفلت من حبائلك».

'হে, দুনিয়া! তুমি আমার নিকট থেকে দূরে চলে যাও। আমি তোমার বাগডোরকে তোমার স্কন্ধেই রেখে দিলাম। তুমি আমার উপর তোমার থাবা বিস্তার করতে চাচ্ছো। কিন্তু আমি কখনো তোমার থাবার মধ্যে পড়বো না—আমি স্বাধীন। তুমি আমার উপর তোমার জাল বিস্তার করতে চাচ্ছো। কিন্তু আমি কখনো তোমার জালে আটকা পড়বোনা। এই আকাশ এবং তার নীচে যা কিছু রয়েছে আমি তা থেকে স্বাধীন। আমি কখনো নিজেকে কোন কিছুর মধ্যে বন্দী করতে চাইনা।' এটাকেই বলে প্রকৃত যুদ্ধ, আর এটাকেই বলে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ।

আজ ১১ই মহরম। নবী বংশের উপর যে সব কঠিনতম দিন অতিবাহিত হয়েছে এই দিনটি তার মধ্যে অন্যতম। আমরা যদি কারবালার ঘটনার আলোক-উজ্জ্বল এবং অন্ধকার—এই দু'টি দিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখতে পাব যে, মানুষের প্রকৃতি বা সৃষ্টিগত ব্যাপারে স্রষ্টা এবং ফিরেশতাদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা বিনিময় হয়েছিল, তা-ই এই দিন কারবালা ময়দানে বাস্তবে ফুটে উঠেছে। ফিরেশতাগণ বলেছিলেন :

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء

হে, আল্লাহ! তুমি পৃথিবীর বুকে এধরনের লোক প্রেরণ করছো, যে সেখানে গিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে।' কিন্তু আল্লাহতায়ালা বলেন :

قال إني أعلم مالا تعلمون

অর্থাৎ 'আমি যা জানি তোমরা তা জান না।' (সূরা বাকারা : ৩০)

অর্থাৎ একদিন মানুষের যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ফিরেশতাদের সম্মুখে ফুটে উঠেছিল, তা সবই কারবালার এই মর্মন্তুদ ঘটনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। আর আল্লাহতায়ালা যা কিছু বলেছেন তথা তোমরা বিষয়টির একটি মাত্র দিক দেখেছো, এর অন্ধকার অংশটাই মাত্র দেখেছো, এর আলোকোজ্জ্বল দিক দেখ নাই—যা শুধু আমিই জানি। অন্য কথায় সমস্ত মানবীয় বৈশিষ্ট্যও এই কারবালার ময়দানেই প্রতিভাত হয়েছে।

এ ছিল একটি চরম পরীক্ষার ময়দান। জালেমগণ এমন পাষাণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছিল, যার কোন নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে মেলেনা। এর মধ্যে একটি ঘটনাতো এই ছিল যে, কোন মাসুম কিশোরের শির তার মায়ের সম্মুখেই দ্বিখন্ডিত করা হয়েছিল এবং

তার দেহকে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল। আর এই হৃদয় বিদারক ঘটনা যা দেখছিলেন।

ইতিহাস আট জন শহীদের কথা উল্লেখ করেছে—যাদের সংগে ইয়াজিদ গোষ্ঠী এই ধরনের পৈশাচিক আচরণ করেছে। এদের মধ্যে তিনজন ছিলেন যুবক এবং অপর পাঁচ জন ছিল মাসুম বাচ্চা। এই আট জনেরই জননীগণ কারবালার ময়দানে উপস্থিত ছিলেন।

এদের মধ্যে একজন ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে হোসাইন—যাকে আমরা আলী আসগর বলে অভিহিত করে থাকি। সে ছিল ইমাম হোসাইনের দুগ্ধ পোষ্য শিশু। যুদ্ধের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, এই মাসুম শিশুর শাহাদাত শিবিরের সম্মুখেই সংঘটিত হয়েছে।

আরেক জন শহীদ হলো কাশেম ইবনে হাসান। তার মাও কারবালার প্রান্তরে উপস্থিত ছিলেন। তার সম্মুখেই কাশেমকে হত্যা করা হয়। কিন্তু আলী আকবরের মাতা কারবালায় উপস্থিত ছিলেন না। আলী আকবরের মা লায়লা কারবালায় উপস্থিত ছিলেন বলে যে একটি কথা আছে, তা ঠিক নয়।

আরেক জন শহীদ হলো আউন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর। জয়নাবে কুবরার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের দু'ছেলেই কারবালার ময়দানে উপস্থিত ছিল। আর উভয়ই শহীদ হয়। এর একজন ছিল জয়নাবের গর্ভজাত সন্তান আর অন্যজন ছিল তার স্বামীর অন্য এক স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। মোটকথা, জয়নাবে কোবরার সন্তানও কারবালার ময়দানে শহীদ হয়েছে।

এই মহিয়সী মহিলার ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা প্রত্যক্ষ করি তা হলো এই যে, তিনি তার ছেলের শাহাদাতের আগে অথবা পরে তার নাম মুখে উচ্চারণ করেন নি। তিনি ইচ্ছা করলে তার নাম স্মরণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ভেবে ছিলেন যে, ইমাম

হোসাইনের সম্মুখে তার নিজের সন্তানের কথা মুখে আনাটা বেআদবী।

জয়নাব তার ভাইকে বলেছিলেন : 'হে, হোসাইন! আমার সন্তান আপনার জন্যে আত্ম বিসর্জন দেয়ার জন্যে উপযুক্ত হয়নি।' আলী আকবরের শাহাদাতের সময় জয়নাব তাবুর মধ্য হতে বেরিয়ে আসেন এবং উচ্চে স্বরে বলেন : হায়, আমার ভাই! হায় আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু নিজের ছেলের শাহাদাতে এমন ভাবে নীরব রইলেন কেন—এ কথা কেউ বলেনি।

আরেক জন যুবক তার মায়ের সম্মুখেই শহীদ হয়েছিলেন; তিনি হলেন ব্লেকেয়া বিনতে আলীর সন্তান এবং মুসলিম ইবনে আকিলের ছেলে। আহলে বাইতের আরেক জন কিশোর যার নাম আমার স্মরণ নেই ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের পর পরই শহীদ হয়েছিল। দশ বছর বয়সের এই ছেলে তাবুর বাইরে অস্থিরতায় সংগে এ দিক সে দিক পায়চারি করছিল। পরিস্থিতির নাজুকতায় সে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন যে, এই কিশোরের উভয় কানেই ইয়ার্রিং বা কানবালা ছিল। হঠাৎ একজন লোক এসে তার শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

আরেক জন কিশোর যার শাহাদাত ছিল অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। ইমাম হোসাইন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কেউ যেন তাবুর বাইরে না আসে। সকলেই তার এই আদেশ মেনে নিলেন। কিন্তু দশ বছরের একটি কিশোর তাবুর বাইরে বেরিয়ে এলো। সে ছিল ইমাম হাসান (আঃ) এর সন্তান—আব্দুল্লাহ। যখন এ ছেলে জন্মগ্রহন করেছিল তখন তার পিতা শহীদ। পিতার শাহাদাতের সময় সে হয়তো মায়ের পেটে ছিল অথবা ছিল দুগ্ধ পোষ্য শিশু। সে যাই হোক, সে বাপের চেহারা পর্যন্ত দেখেনি। সে ইমাম হোসাইনের স্নেহ ছায়ায়ই লালিত পালিত হয়েছিল। অর্থাৎ ইমাম হোসাইন তার চাচাও ছিলেন এবং প্রতিপালনের দিক থেকে পিতাও ছিলেন। ইমাম হোসাইন তাকে

অত্যধিক স্নেহ করতেন।

যখন শহীদ কুল শিরোমণি হযরত ইমাম হোসাইন শত্রুর নিষ্ঠুর আক্রমনে ক্ষত বিক্ষত হয়ে স্বীয় প্রভুর সমীপে মুনাজাতে মশগুল তখন সে ছেলে শিবির থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। হযরত জয়নাব অনেক চেষ্টা করেছিলেন যাতে সে তাবুর মধ্য থেকে বেরিয়ে না আসে। কিন্তু তাকে রক্ষা করা গেলনা। সকল বাধা বন্ধন ডিংগিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এলো এবং বললো : খোদার কসম, আমি আমার চাচা থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারিনা। সে দৌড়ে গিয়ে ইমাম হোসাইনের কোলে বসে পড়লো।

আল্লাহ মহান পবিত্র, ইমাম হোসাইনের কি ধৈর্য এবং কি তার অন্তর, তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন। তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরলেন। ইত্যবসরে এক জালেম হযরত ইমাম হোসাইনের উপর আঘাত করতে উদ্যত হলো। কিন্তু এই কিশোর সহসা বলে উঠলো : তুমি আমার চাচাকে শহীদ করতে চাচ্ছো? একথা বলেই তার হাত তলোয়ারের দিকে এগিয়ে দিলো। তার হাত কেটে গেলো। চাচা, চাচা বলে সে চীৎকার করে উঠলো। ইমাম হোসাইন তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন : হে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ধৈর্য অবলম্বন করো। শীঘ্রই তুমি তোমার পিতা এবং নানার দরবারে পৌছে যাবে।

হে, প্রভু, আমাদের অন্তর সমূহকে ঈমানের নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। হে, খোদা, আমাদের অন্তর সমূহকে আপনার এবং আপনার অলিদের ভালোবাসায় পূর্ণ করে দিন। আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করে দিন।

হে, খোদা, যে সব মুসলমান আজ রোগাক্রান্ত এবং যারা দোয়ার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন, তাদেরকে আত সুস্থ আরোগ্য দান করুন। আমাদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

হে, খোদা! আমাদের প্রচেষ্টা সমূহ এবং যে কোন লোক যে কোন উপায়ে হযরত ইমাম হোসাইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে এবং মুসলমানদেরকে পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে চেষ্টা সাধনা করছে, আপনি দয়া করে তা মঞ্জুর করুন। আর আমাদের উপর ইহকাল ও পরকালের কল্যান বর্ষণ করুন! —আমীন!

ولاحول ولاقوة إلاّ بالله العلي العظيم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

হিজরত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالا ته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد(ص) وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى:

«ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله...»

পবিত্র কুরআনে যে বিষয় গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং ইসলামের ফিকা শাস্ত্রেও যার বিশেষ স্থান রয়েছে তার মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে 'হিজরত'। হিজরতের ব্যাপারে অনেক লোকেরই ধারণা হচ্ছে এই যে, এটি হচ্ছে শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা—যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঘটেছিল এবং নবী করিম(সঃ)এবং তার অনুসারী সাহাবীগণ মক্কা থেকে রওয়ানা দিয়ে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। আর এ ঘটনাটিই হিজরী সালের ভিত্তি রচনা করেছিল।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এটি ইসলামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্পর্কেও কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু হিজরত কি শুধুই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা?

হিজরতের বিষয়টি কুরআন মজিদে একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে। মুহাজির এবং মুজাহিদদের সংগে সংগে হিজরত এবং জিহাদকে একই মর্যাদায় অভিসিক্ত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

«والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله»

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে। (সূরা আনফাল : ৭৪)

এসব কিছুই কি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সংগে সংশ্লিষ্ট এবং তা অতীত হয়ে গেছে? ইসলামের প্রাথমিক যুগ অতিক্রম করার পর হিজরতের মূল ভাবধারা এবং অর্থ ও তাৎপর্য কি আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গেছে? অথবা ঈমান এবং জিহাদের সংগে সংগে তার অস্তিত্ব এখনো বর্তমান রয়েছে ?

আমাদের মনে রাখা কর্তব্য যে, যে ভাবে ঈমান এবং জিহাদ শুধু ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংগেই সংশ্লিষ্ট নেই, বরং প্রত্যেক যুগ ও কালেই তার অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি ভাবে হিজরতও শুধু ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নেই। ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'হিজরত' নামে যে জিনিষ বা কাজটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা মূলতঃ জিহাদের মতোই এবং ইসলামে এর একটি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে।

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আঃ) তার নাহজুল বালাগায় হিজরতের ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলেছেন : «الهجرة على حد الاول»

অর্থাৎ হিজরতের আদেশ বা হুকুম প্রথমবার ও প্রাথমিক অবস্থার

মতোই অবশিষ্ট বা বিদ্যমান রয়েছে। এ বিশেষ কোন কাল অথবা বিশেষ কোন স্থানের জন্যে সীমাবদ্ধ নেই। কেননা, সে যুগে নবী করিম(সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। সুতরাং তার অনুসরনে হিজরতের কাজটি সমস্ত মুসলমানের উপর ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল। আর রাসুল(সঃ)এর মদীনা গমনের সময় যারা তার সংগে ছিলেন তাদেরকেই 'মুহাজির' বলা হয়ে থাকে। অতএব, হযরত আলী(আঃ)এর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কেউ এ কথা বলতে পারেনা যে,

নবী করিম(সঃ)এর তিরোধানের পর হিজরত এর তাৎপর্য ও অর্থ অনুর্নিহিত হয়ে গেছে।

এখন আমাদের ভলিয়ে দেখা প্রয়োজন যে, হিজরতের প্রকৃত অর্থ কি? যদি হিজরতের অর্থ এই হয় যে— নিজের ঈমানকে বাচিয়ে রাখার জন্যে ঘর বাড়ী, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাওয়া, তাহলে মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী এ ধরনের আদর্শ কোন দেশ কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তবে এ কথা সত্য যে, পরিস্থিতির চাহিদা ও দাবীর উপরই সব কিছু নির্ভরশীল।

হিজরতের যথার্থ যখন ঈমান রক্ষার প্রয়োজনে ঘর বাড়ী ত্যাগ করা এবং নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দময় জীবনকে পরিহার করা তখন এর প্রকৃত অর্থতো এটাই যে, যখ নই আমাদের ঈমান সংকটের সম্মুখীন হবে, আমাদের সমাজ এবং ইসলামের উপর নানান ধরনের বিপদ আপদ নেমে আসবে—তখন এ সব সংকট ও বিপদ আপদকে উত্তরণের জন্যে আমাদেরকে ঘর বাড়ী ত্যাগ করে কোথাও চলে যেতে হবে—হিজরত করতে হবে। এই ভাবে হিজরত করেই আমাদের ঈমান, সমাজ এবং ইসলামকে রক্ষা করতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এমন একটি আয়াত রয়েছে যার মধ্যে সে সব

লোকেরা বড়াই ব্যক্ত হয়েছে যারা পরিবেশের বাধ্যবাধকতার ওজর ও বাহানা পেশ করে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে বেড়ায়। বর্তমান যুগে অনেক লোকই 'পরিবেশ' এবং 'পরিবেশের বাধ্যবাধকতা' জাতীয় বাহানা তুলে থাকে। যদি কাউকে বলা হয় যে, জনাব আপনি কেন এ ধরনের ভুল করছেন? অথবা কোন মহিলাকে যদি বলা হয় যে, আপনি কেন বেপর্দা ঘর থেকে বের হয়েছেন? তখন তাদের পক্ষ থেকে এ জবাবই আসে যে, পরিবেশ এরূপ, আমরা কি করবো? যদি কাউকে বলা হয় যে, জনাব আপনি এ ধরনের মজলিসে কেন আসা যাওয়া করছেন, যেখানে অংশ গ্রহন করা নিতান্তই গুনাহের কাজ। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কেন হালাল খাদ্য গ্রহন করছেন না? অথবা এমন ধরনের অনুষ্ঠানে কেন যাচ্ছেন—যেখানে মদ্য পান করা হয়ে থাকে? তখন জবাব দেয়া হয় যে, কি করা যাবে পরিস্থিতি তো এরূপই। পরিবেশ ও সমাজ যখন এ ধরনের তখন আমরা কি করতে পারি?

আসলে সমাজ এবং পরিবেশের ওজর পেশ করাটা অনেক লোকেরই একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। তবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এটা কোন গ্রহন যোগ্য ওজর হতে পারেনা। পরিবেশ এরূপ ছিল, সমাজের অবস্থা এরূপ ছিল, সুতরাং আমরা কি করতে পারি—কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা আমাদের এধরনের ওজর গ্রহন করবেন না। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমতঃ আমাদের পরিবেশ কে সংশোধনের চেষ্টা করা এবং তাকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুকূলে গড়ে তোলা। কিন্তু যদি আমরা দেখি যে, আমরা আমাদের পরিবেশ ও সমাজকে ইসলামী জীবন বিধান মোতাবেক গড়ে তুলতে বা চালাতে পারছিনা এবং আমাদের ছেলে মেয়ে ও ভবিষ্যত বংশধরদের ঈমান রক্ষা করাই এক কঠিন ব্যাপার, তাহলে এই ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ ও বিধান হচ্ছে এই ধরনের পরিবেশ ও সমাজকে পরিত্যাগ করা। এই পরিবেশ চাই কোন শহরের বা কোন

দেশের হোক বা কোন মহল্লার পরিবেশই হোক না কেন এইরূপ পরিস্থিতিতে তাকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

অনেক বড় বড় শহরের মহল্লা সমূহের মধ্যেও বিপুল পরিমানে ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। হয়তো এমন কোন মহল্লাও রয়েছে যেখানে শতকরা একশ জন লোকই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুসারী। আর তাদের ছেলে মেয়েদেরকেও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুকূলে শিক্ষা দীক্ষা প্রদানের সুযোগ সুবিধা রয়েছে। কিন্তু এই মহল্লা ত্যাগ করে অন্য কোন মহল্লায় স্থানান্তরিত হলে দেখা যাবে যে, পূর্ববর্তী মহল্লার তুলনায় শতকরা একশ ভাগই ভিন্নতর ও ব্যবধান। না মহল্লার অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামী চরিত্র ও পরিবেশ রয়েছে আর না এই মহল্লার মধ্যে ইসলামের কোন আলামত বা চিহ্ন রয়েছে। না এখানকার নারী পুরুষ ইসলামের কোন একটি বিধানকে মেনে চলছে। এছাড়া এখানে না আছে কোন মসজিদ আর না আছে কোন কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র ও ওয়াজ নসিহতের সভা সমিতির ব্যবস্থা। এমনকি এখানে হয়তো আল্লাহ রাসূলের নাম উচ্চারণ করার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবেনা। বরং এর বিপরীতে যদি কোন লোক অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে পথ চলতে থাকে, তাহলে সে শুনতে পাবে যে, কোন ঘর থেকে ভেসে আসছে সংগীতের আওয়াজ আর কোন ঘর থেকে ভেসে আসছে খেলা ধুলা ও গান বাদ্যের আওয়াজ। আবার হয়তো কেউ তার পোষা কুকুর গুলোকে সংগে করে বেড়াতে বেরিয়েছে এই সাত সকালে। মোটকথা, এই ধরনের লোকদের সংগেই হয়তো তার সাক্ষাৎ ঘটবে যাদের মধ্যে ইসলামের কোনই চিহ্ন খুজে পাওয়া যাবে না। হতে পারে যে, এধরনের পরিবেশ সে সব পিতামাতার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে না—যারা ইসলামী পরিবেশেই লালিত পালিত ও বর্ধিত হয়েছে। তারা বিশ বছর পর্যন্ত এ ধরনের পরিবেশে থাকলেও হয়তো তাদের কোন পরিবর্তন হবেনা। কিন্তু যে

শিশুটি চক্ষু উন্মীলিত করার পর শুধু এ ধরনের সমাজ বা পরিবেশই প্রত্যক্ষ করেছে এবং এখানেই লালিত হয়েছে তাকে কখনো একজন মুসলমানের সন্তান হিসেবে আর চেনা যাবে না।

তাহলে এ অবস্থায় একজন লোকের কি কর্তব্য রয়েছে? যে সব লোক এ ধরনের স্থানে যাবে তাদের কর্তব্য হলো এই ধরনের সমাজ ও পরিবেশকে ইসলামী সমাজ ও পরিবেশে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা। যদি সেখানে কোন মসজিদের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে তাদের দায়িত্ব হলো মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা। শুধু মসজিদ তৈরী করাই যথেষ্ট নয়। বরং সেখানে কুরআন শিক্ষা ও দীনের প্রচার ও প্রসারের জন্যে বিভিন্ন প্রকারের সভা সমিতির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি এ ধরনের কর্ম প্রচেষ্টায় কেউ সফল হয়ে যায়, তাহলে উক্ত এলাকা বা মহল্লার লোকেরা যে আল্লাহতায়ালার বিরোধিতা থেকে বিরত থাকবে শুধুতাতাই নয়, বরং ইসলামের প্রচার ও প্রসার কল্পে যে সব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাপনা করেছে, তার প্রতিফল সে আল্লাহতায়ালার নিকট থেকেই পেতে পারে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

«ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها».

যারা নিজেদের উপর অবিচার করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফিরেশতাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিলনা?' (সূরা নিসা : ৯৭)

আসলে এ সব লোক ফিরেশতার প্রশ্নের যে উত্তরই দেবে যে ভাবে তারা দুনিয়াতে ইসলামী অনুশাসন যোতাবেক না চলার জন্যে

মানুষের নিকটে অর্থহীন ওজর পেশ করতো। আর তারা মনে করতো যে, এটি তো তাদের গ্রহন যোগ্য ওজর আপত্তি। তারা বলবে, আমরা তো পৃথিবীর বুকে নিতান্তই অসহায় ছিলাম। আমরা কোথাও যেতে পারতামনা। আমরা পৃথিবীর বা দেশের এক কোণে অসহায় অবস্থায় পড়ে ছিলাম। না শিক্ষা দীক্ষা অর্জনের কোন সুযোগ ছিল, আর না কোন জ্ঞানী গুণী ও আলেমের কাছে আমরা যেতে পারতাম। কোন উপযুক্ত শিক্ষক অথবা কোন মুরুব্বী জনের নিকট যাওয়া আসারও আমাদের কোন ক্ষমতা ছিলনা। কাজেই আমরা আদৌ জানতাম না যে, ইসলাম কি এবং কাকে বলে? কেউই আমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করেনি। আমরা এমন এক জায়গায় ছিলাম যেখানে আমাদের কোন অধিকার ছিলনা। পরিবেশ একান্তই খারাপ ছিল। আদৌ অনুকূল ছিলনা। মোট কথা, তারা বিভিন্ন প্রকারের ওজর আপত্তি এবং বাহানা পেশ করবে। কিন্তু ফিরেশতাগণ কি তাদের এ সব ওজর আপত্তি মেনে নিবেন? তারা কি বলবেন যে, হাঁ, বেশ তোমরা তো সত্য কথাই বলছো এবং সত্যিই তোমরা পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলে। আর যেহেতু তোমাদের পরিবেশ খারাপ ছিল, কাজেই তোমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিবেন। না, বরং তারা বলবেন : আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিলনা? তোমাদেরকে কে বেধে রেখেছিল? এধরনের খারাপ পরিবেশ ও খারাপ সমাজে তোমাদেরকে কে আটকিয়ে রেখেছিল? গোটা দুনিয়ার অবস্থা কি তোমাদের এই ভূখন্ডের মতোই ছিলো? দুনিয়ার কোন প্রান্তেই কি তোমাদের জন্যে এমন কোন জায়গা ছিলনা—যা তোমাদের বসবাসের জন্যে সম্পূর্ণ উপযোগী? কাজেই তোমরা যদি সেখানে হিজরত করে যেতে তাহলে তোমাদের দ্বীন এবং ঈমান সব কিছুইতো রক্ষা পেতো। তোমরা তা করলে না কেন? অর্থাৎ তোমরা হিজরত কেন করলে না?

এ থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, সামগ্রিক ভাবেই ইসলামে হিজরতের একটি মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে। আর হিজরতের এই আদেশ সর্ব কালের জন্যেই বলবৎ থাকবে। এই আদেশ কখনো বাতিল হয় নাই। আর না শুধু ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের সংগেই এ সংশ্লিষ্ট ছিল।

'আর যে কেউ নিজ গৃহ হতে বের হয়, ...' এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে কিছু সংখ্যক লোক অতিরঞ্জিত করেছেন। যার ফলে অনেক ভুল বুঝা বুঝির সৃষ্টি হয়েছে—যার নিরসন হওয়া কর্তব্য। তারা বলেন : 'যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে বের হয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের দিকে গমন করে—এটাতো ঠিক কথাই এবং এ ব্যাপারে কোন দ্বিমতেরও অবকাশ নেই। আলোচ্য আয়াতের প্রারম্ভে ঘরের কথা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মনজিলে মাকসুদ তথা লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরতের ব্যাপারটি অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। অন্তরের নিষ্ঠার সংগেই তা জড়িত। এ নয় যে, ঘর বাড়ী ত্যাগ করে কোন ভিন দেশে বা এলাকায় চলে যেতে হবে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো ঘরের এক কোনে বসে বসে আল্লাহর জিকির করা, স্বীয় আত্ম শুদ্ধির অনুশীলন চালানো, আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা, নামাজ পড়া, রোজা রাখা এবং দোয়া কালাম পড়া ইত্যাদি।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। আর তা হলো এই যে, সফরের লক্ষ্য কি? এর জবাবে বলা হয় যে, এর লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর সংগে মিলিত হওয়া। সুতরাং আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্য লাভের জন্যে কত গুলো স্তর এবং পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। আর সে সব পর্যায় অতিক্রম করার জন্যে সফরের প্রয়োজন, নিজের আমিত্বকে ত্যাগ করা প্রয়োজন। বাহ্যিক ভাবে কোন মনজিল বা বাসস্থান ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই।

আর এই দৃষ্টিভংগি অনযায়ী পবিত্র কুরআনের এই বাক্যটি 'যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে হিজরত করে'—এর অর্থ হলো স্বীয় আমিত্ব এবং মনোজগত থেকে বের হয়ে আল্লাহর দিকে হিজরত করা। তাহলেই এর প্রতিফল আল্লাহতায়ালা প্রদান করবেন।' এ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ একান্তই ভুল। কেননা, কুরআন মজিদ উভয় হিজরতের কথাই বর্ণনা করেছে। লক্ষ্য যোগ্য বিষয় এই যে, কুরআনে যে ঘরের কথা ব্যক্ত হয়েছে তা দ্বারা তো মনুষ্য নির্মিত ঘরের কথাই বুঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ হে, মানুষ। তুমি যদি স্বীয় ঘর বাড়ী ত্যাগ করে হিজরত করতে ইচ্ছুক, ইচ্ছুক এক শহর থেকে অন্য শহরে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যেতে, তাহলে এ দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য যেন আল্লাহকে লাভ করাই হয়। তুমি যদি হিজরত করতে করতে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাও, স্বীয় ভাই বোন, স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদের থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে যাও, সে ক্ষেত্রেও তোমার লক্ষ্য হবে শুধু একটিই--আর তা হচ্ছে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ। এই অবস্থায় তুমি এর পুণ্য অবশ্যই লাভ করবে। আর যদি তোমার উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ না হয়ে থাকে, তাহলে এর কোন মূল্য নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন :

«من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى مال يناله أو امرأة يصيبها، فهجرته الى ماهاجر اليه»

'যার হিজরত হবে আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশে তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশে ই গন্য হবে, আর যার হিজরত হবে পার্থিব ধন সম্পদের জন্যে সে তাই পাবে অথবা যদি তা হয় কোন নারীকে লাভ করার জন্যে তবে তার হিজরত সে দিকেই গন্য হবে যার জন্যে সে হিজরত করেছে। (সহিহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃঃ২২)

নবী করিম (সঃ) বলেন, আমার প্রয়োজন নিষ্ঠাবান মুহাজিরের। মক্কা অথবা অন্য কোন শহর থেকে কেউ মদীনায় আগমন করলেই মুহাজির হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে মুহাজির তাকেই বলা যেতে পারে যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই এবং আল্লাহর পথেই হিজরত করে। আর কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে হিজরত না করলে তার হিজরতের কোন ফায়দা নেই।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে ভাবে হিজরতের জন্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রয়োজন আছে, ঠিক তেমনি ভাবেই জিহাদের জন্যেও সদিচ্ছা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। যদি এরূপ না হয় তাহলে হতে পারে যে, কোন লোক মুসলমানদের সারিতে থেকে শৌর্য বীর্য ও বাহাদুরীর পরিচয় দিবে এবং অন্যান্য সৈনিকদের তুলনায় ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রমান তুলে ধরবে এবং অন্যদের তুলনায় বেশি বেশি দুঃখ কষ্টও ভোগ করবে, কিন্তু যদি তার দিলের খবর লওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, তার এসব চেষ্টা প্রচেষ্টা শুধু প্রসিদ্ধি লাভের জন্যেই হয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়াতে যাতে তার বাহাদুরীর গুণ কীর্তন করা হয়, তার বীরত্বের ছবি যেন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ইতিহাসে তার নাম যাতে চির স্মরণীয় হয়ে থাকে। অথবা যুদ্ধে যোগদানের জন্যে এই উদ্দেশ্যে তার নাম লেখানো হয় যে, কোন না কোন ভাবে সে বেচে যাবে এবং আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে। অথচ বীরদের তালিকায় তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং এরই ফলশ্রুতিতে অনেক মূল্যবান পারিতোষিক লাভ করতে পারবে, এমনকি কোন সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করতে সমর্থ হবে। মোটকথা, এ ধরনের লোকেরা দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়টাই লাভ করতে চায়, কিন্তু তাদের জানা নাই যে, এধরনের কাজ কস্মিন কালেও আল্লাহর পথে জিহাদের মধ্যে শামিল নয়। এ কথা সত্য যে, আল্লাহর পথে জিহাদের মাধ্যমে দুনিয়ার স্বার্থও অর্জিত হয়ে থাকে— তবে এই শর্তে যে, দুনিয়া

যেন তার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত না হয়।)

সম্ভবতঃ অহুদের যুদ্ধে অথবা অন্য কোন যুদ্ধে আনসারদের মধ্য থেকে কোন একজন লোক খুব বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করেছিল। সে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। অনেক লোককেই সে হত্যা করেছিল। অবশেষে সে আহত অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। তার এই অবস্থা দেখে কিছু সংখ্যক লোক নবী করিম(সঃ)এর দরবারে নিবেদন করলো :হে, আল্লাহর রাসুল! এই ব্যক্তি রণাংগনে বেশ কীর্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে—বীরত্ব প্রদর্শন করেছে।'কিন্তু নবী করিম (সঃ)তাদের কথার দিকে কোন খেয়ালই দিলেন না। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হলো যে, নবী করিম(সঃ)কেন তাদের এসব কথার প্রতি কোন গুরুত্ব দিলেন না। তিনি তার আত্ম ত্যাগের কোন মূল্যই দিলেন না। ইত্যবসরে একজন মুসলমান উওহ আনসারীর শিয়রের নিকটে এসে বলতে লাগলো:'তোমাকে অশেষ মুবারকবাদ! আল্লাহতায়ালা তোমার মংগল করুন। তুমি বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছ। তুমি শাহাদাতের গৌরব অর্জন করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছো।'কিন্তু সে বললো:এই সব কথাবার্তা ত্যাগ করো। শহীদ' কাকে বলে এবং'আল্লাহর পথে' কি জিনিস তা আমি জানি না। যখন আমি দেখলাম যে,মদীনার লোকেরা মক্কার লোকদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তখন আমিও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি। মদীনার প্রতি পক্ষপাতিত্বই আমাকে এই যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে। তুমি যা কিছু বলছো সে জন্যে আমি যুদ্ধ করতে আসিনি।'

তখন সে ব্যথায় চীৎকার করছিল। সে কোন প্রকারে উঠে দাড়ালো এবং তলোয়ার বুকের উপর রেখে বললো : ব্যথার যন্ত্রনা আমার সহ্য হচ্ছে না।'আর একথা বলেই সে তলোয়ার বুকের মধ্যে বিদ্ধ করে দিল। এই ভাবে সে আত্ম হত্যা করে মৃত্যু বরণ করলো। এখন লোকেরা বুঝতে পারলো যে, নবী করিম(সঃ)তাদের কথায়

কেন কর্ণপাত করেননি। তারা আরো অনুধাবন করতে পারলো যে, জিহাদের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে কেউ যেন আল্লাহতায়ালার পথেই লড়াই করে এবং হিজরতও শুধু আল্লাহর জন্যেই হতে হবে। অর্থাৎ বাহ্যিক সফর বা ভ্রমনের সংগে সংগে তা যেন আল্লাহর দিকেও ভ্রমন হয়ে থাকে। তথা উভয় অর্থেই যেন সফর হয়ে থাকে। লোকেরা যেন মুহাজিরও হয় এবং সংগে সংগে আল্লাহর দিকে ভ্রমনকারীও হয়। ইসলাম একই সংগে এই উভয় বৈশিষ্ট্যই একজন লোকের মধ্যে দেখতে চায়। আর আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থও তাই।

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে একই সময়ে উভয় হিজরতই অবলম্বন করা। এর একটি হচ্ছে শারীরিক হিজরত এবং অন্যটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক হিজরত। মানুষের শরীর সত্তা যদি এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত হয় তাহলে সে আমিত্ব ও অহংকারের স্তর অতিক্রম করে নিষ্ঠা ও আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের মনজিলে পৌঁছে যায়। আর এধরনের মুজাহিদদের জন্যেই আল্লাহতায়ালা বলেছেন:'তার প্রতিফল ও প্রতিদান আল্লাহতায়ালাই প্রদান করবেন।' অর্থাৎ এ ধরনের লোকের পুণ্য ও পারিতোষিক একমাত্র আল্লাহতায়ালার নিকটেই রয়েছে। আর এ হচ্ছে একটি উচ্চ স্তরের ব্যাখ্যা যা দ্বারা একটি মহান লক্ষ্য কে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। এখন আমাদের চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন যে, এ ধরনের মুহাজিরদের জন্যে কি ধরনের পুরস্কার হতে পারে?

কোন কোন মুফাসসির এই পবিত্র আয়াতটির ব্যাখ্যায় ব্যাপকতার কথা উল্লেখ করেছেন। হতে পারে যে, হাদীসের মাধ্যমে এই ব্যাপকতার কথা বিশ্লেষিত হয়েছে। সে যাই হোক, এটি একটি উত্তম ব্যাখ্যা। আর তা হচ্ছে এই যে, এই আয়াতের আলোকে হিজরতের মধ্যে সে সব লোকও শামিল রয়েছে যারা দ্বীনি শিক্ষা দীক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ হতে বের হয়ে অন্যত্র চলে যায়।

এক শহর থেকে অন্য শহরে অথবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করে। অর্থাৎ তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনের ইলম অর্জন করা— যাতে তারা ইলম অর্জনের পর লোকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে, নিজেদের আত্ম শুদ্ধি লাভ এবং অন্যদেরকেও সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। বিদ্যা শিক্ষা লাভের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য সম্পদ উপার্জন নয়, নয় কোন সুনাম সুখ্যাতি লাভ। যে সব লোক নিজেদের ঘর বাড়ী ত্যাগ করে শিক্ষা দীক্ষার উদ্দেশ্যে অন্য কোন এলাকায় যায়, আর তাদের এযাওয়ার পিছনে একটি মাত্র উদ্দেশ্যই রয়েছে যে, তারা দ্বীনের ইলম অর্জন করতঃ তার মাধ্যমে শুধু ইসলামী সমাজের প্রয়োজনকে পূর্ণ করবে। এই ভাবে সেই সব লোকও এই দলের মধ্যে গণ্য যারা মনে করেন যে, ইসলামী সমাজের জন্যে তাওশারের প্রয়োজন—প্রয়োজন প্রকৌশলীর, সুতরাং এই প্রয়োজন কে পূর্ণ করা একান্ত কর্তব্য। তাই তারা এ সব বিষয়ে ইলম অর্জনের জন্যে ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়েন। আর একারনেই এ সব লোক মুহাজিরদের তালিকায় স্থান লাভ করেন। তবে যে সব লোক নিজেদের পকেট ভর্তি করার জন্যে এবং সুনাম সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদ্যা অর্জনের করে তারা এদের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমোক্ত লোকদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'আর যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসুলের উদ্দেশ্যে হিজরতের জন্যে নিজ গৃহ থেকে বের হয় অতঃপর এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তার প্রতিফল ও প্রতিদান আল্লাহতায়ালাহ প্রদান করবেন।'

যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু উপস্থিত হয় তাহলে সে মুহাজির হয়ে মৃত্যু বরণ করবে। অর্থাৎ শহীদের ছোট ভাই হিসেবে মৃত্যু বরণ করবে। কেননা, মুহাজির মুজাহিদের ছোট ভাই। পবিত্র কুরআন বলে, যে লোক আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই হিজরত করে এবং এই অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে, তাহলে তার পুরস্কারতো

আল্লাহতায়ালার নিকটেই রয়েছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 'মুহাজির' এই শব্দটিকে সব সময়ই 'মুজাহিদ' শব্দটির সংগে ব্যক্ত ও বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের এবং সমাজের লোকদের ঈমান সংরক্ষণের জন্যে স্বীয় গৃহ থেকে বের হয়ে কোথাও গমন করে সে ব্যক্তি একই সংগে মুহাজির এবং মুজাহিদ। আর উপরোক্ত আয়াত এবং আল্লাহর পথে জিহাদ সংক্রান্ত অন্যসব আয়াত এই সব লোকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন বলা হয়েছে :

«ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن».

'নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা বিশ্বাসীদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে (অসৎ ব্যক্তিদের) হত্যা করে অথবা নিজেরা নিহত হয়। বস্তুতঃ তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এই প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ।

(সূরা তাওবা : ১১১)

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী হোসাইন ইবনে আলী (আঃ) মুহাজির এবং মুজাহিদ উভয়ই। তিনি ইসলাম এবং ইসলামের আদর্শ ও নিদর্শন সমূহ সংরক্ষণার্থেই নিজের ঘর বাড়ী প্রভৃতি ত্যাগ করে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। যেমন হযরত মুসা (আঃ) স্বীয় বাসভূমি মিশর ত্যাগ করে মাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। হযরত মুসা (আঃ) মুহাজির ছিলেন এবং হযরত ইবরাহিম (আঃ) ও মুহাজির ছিলেন। তারা প্রত্যেকে বলেছিলেন : 'আমি আর প্রভুর দিকেই গমন করছি, আর তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।'

হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজের ঘর বাড়ী এবং শহর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মোটকথা, তিনি একজন মুহাজির ছিলেন। হযরত হোসাইন একই সংগে মুহাজিরও ছিলেন এবং মুজাহিদও

ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুহাজিরগণ —যাদের ব্যাপারে জিহাদের নির্দেশ তখনো অবতীর্ণ হয়নি, তারা মুহাজিরই ছিলেন। কিন্তু যখন তাদের উপর জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হলো তখন থেকে তারা মুজাহিদও আখ্যায়িত হতে লাগলেন। অন্য দিকে ইমাম হোসাইন জীবনের প্রথম দিন থেকেই মুহাজির এবং মুজাহিদ ছিলেন।

নবী করিম (সঃ) তাকে স্বপ্ন যোগে বলেছিলেন : হে, আমার হোসাইন! আল্লাহতায়ালা তোমার জন্যে এমন সব উচ্চ মর্যাদা রেখেছেন, যা তুমি কেবল শাহাদাতের মাধ্যমেই অর্জন করতে পার।

ইমাম হোসাইন আনুমানিক ২২ অথবা ২৪ দিন হিজরত অবস্থায় ছিলেন। মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে কারবালায় এসে পৌঁছাতে তার এ পরিমান সময় লেগে গিয়েছিল। তিনি ৮ ই জিলহজ্ব মক্কা থেকে রওয়ানা করেন ২রা মহরম কারবালা এসে পৌঁছেন। তিনি যে দিন মক্কা থেকে রওয়ানা করেন সে দিন এক ভাষনে হিজরত এবং জিহাদকে একই সংগে বর্ণনা করেছেন :

«خُطَّ الموتُ على ولد آدم مَخَطَّ القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني الى أسلافي، اشتياق يعقوب الى يوسف».

'হে, লোক সকল! যুবতী মেয়ের গলায় স্বর্ণের হারের মতোই আদম সন্তানের জন্যে মৃত্যু অবধারিত। পূর্ব পুরুষের সংগে আমার মিলিত হওয়ার যে বাসনা তা ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি ইয়াকুব (আঃ) এর স্নেহ অনুরাগের মতোই।'

তিনি আরো বলেন : 'হে, লোক সকল! আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে, সে কারবালার ময়দানে নরুচারী জন্তু জানোয়ার আমার দেহকে টুকরা টুকরা করে খাচ্ছে।' কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত আমাদের আর কোন সন্তুষ্টি নেই। আল্লাহ যা পছন্দ করেন, আমাদের পছন্দ তাই। তিনি যদি আমাদের রোগাক্রান্ত হওয়াকেই পছন্দ করেন

তাহলে আমরা তাতেই রাজী আছি। আর তিনি যদি আমাদের সুস্থ থাকা পছন্দ করেন, তবে তাতেও আমরা রাজী আছি। তিনি যদি আমাদের নীরবতা কামনা করেন, তাহলে আমরা নীরব থাকাই পছন্দ করবো। আর তিনি যদি কথা বলা পছন্দ করেন, তবে আমরা কথা বলবো। মোটকথা, আমাদের অংগ প্রত্যংগ এবং শরীরের যাবতীয় স্পন্দন ও স্তব্ধতা তাঁর মর্জির উপরই নির্ভরশীল। কবি বলেন :

قضایم اسیر رضا می پسندد رضایم بر آنچه قضا می پسندد
چرا دست یازم چرا پای کوبم مرا خواجه بی دست و پای پسندد

'আমার তকদীর আমাকে সনুষ্টির কাছে বন্দী দেখতে চায়। আর আমার সনুষ্টিও সে কথায় বিশ্বাসী যার উপর আমার তাকদীর রাজী রয়েছে। আর আমার প্রভু যখন আমাকে হাত-পা হীন অবস্থায় দেখতে চান তখন শুধু শুধু কেন আমি হাত পা আন্দোলিত করবো। হাঁ, সংক্ষেপে যে কথাটি বলতে চাচ্ছি তা হলো এই যে, আগামী দিন তোমাদের কেউতো আর বেচে থাকছে না।

«فمن كان باذلاً فينا مهجته موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحاً ان شاء الله».

'যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় অন্তরের শোনিত ধারাকে তার পথে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত সে যেন আমাদের সংগে হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহন করে। কেননা, ইনশাল্লাহ আমি আগামী কাল সকালে এখান থেকে যাত্রা করবো।'

অনেক লোকই ইমাম হোসাইনের সংগে রওয়ানা করলেন। প্রথমতঃ এমন কিছু সংখ্যক লোকও তার সাথী হলেন যারা ভেবেছিল যে, ইমামের কথার মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন রয়েছে, হতে পারে যে, তারা বেচে যাবে। এই ভাবে এরূপ ধারনার বশবর্তী হয়ে পথিমধ্যেও

কিছু সংখ্যক লোক তার সংগে এসে মিলিত হলো। কিন্তু ইমাম হোসাইন অধিকন্তু দুর্বল ও অক্ষম লোকদেরকে তার সংগে রাখতে রাজী হলেন না। তিনি পথিমধ্যেও কয়েকবার অনুরূপ ভাষণ দিলেন। যাতে আনুরিকতা হীন লোকেরা তার কাফেলা থেকে কেটে পড়ে এবং একমাত্র নিষ্ঠাবান সংগীগণই তার সংগে থাকে। আর পরিশেষে এটাই হয়েছে। সর্বশেষ অবস্থায় তার সংগে এমনি ধরনের কিছু সংখ্যক লোকই ছিলেন, যাদের সম্পর্কে ইমাম হোসাইন বলেছিলেন: 'আমি আমার সংগীদের চেয়ে আর কারো সংগীদেরকে উত্তম ও বিশ্বস্ত বলে মনে করি না। যদি আমার সংগীগণ ও বদরের যোদ্ধাদের মধ্যে তুলনা করা হয়, তাহলে আমি আমার সংগীদেরকেই অগ্রাধিকার দান করবো। যদি অহুদের যোদ্ধা ও আমার সংগীদের মধ্যে তুলনা করা হয়, তাহলে আমি আমার সংগীদেরকেই অগ্রাধিকার দেব। যদি আমার সংগীগণ ও সিফফিনের যোদ্ধাদের মধ্যে তুলনা করা হয় তাহলে আমি আমার সংগীদেরকেই বেশি গুরুত্ব দেব। কেননা, আমার সংগীগণ সকলের চেয়ে উত্তম।'

আশুরার রাতে ইমাম হোসাইন তার সংগীদেরকে বিদায় দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: 'আমি তোমাদের কাছ থেকে আমার 'বাইয়াত' প্রত্যাহার করলাম। তোমাদের জন্যে এই অনুমতি রয়েছে যে, তোমরা আমাকে ত্যাগ করে রাতের অন্ধকারে কোথাও চলে যাও। কেননা, তোমাদের ব্যাপারে শত্রুর কোনই উদ্বেগ নেই, তারা তো শুধু আমারই জানের শত্রু।'

কিন্তু তার সংগীদের সবাই নিবেদন করলো: 'হে, আমাদের মাওলা! আমরা আপনার খেদমত থেকে শাহাদাতের পথকে নির্বাচন করে নিয়েছি। এই একটি মাত্র জীবনের কি মূল্য আছে। আমরা যদি হাজার লোকও হতাম, তাহলেও আপনার জন্যে আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিতাম।' ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে যে, সর্ব প্রথম যিনি

এই কথা গুলো বলেছিলেন তিনি ছিলেন ইমামের ভাই আবুল ফজল আল আব্বাস। এ কথা শোনার পর ইমাম হোসাইনের অন্তর খুশিতে ভরে গেলো। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তার সকল সংগী আকিদা বিশ্বাস, লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে তারই সংগে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রয়েছে।

এরপর ইমাম বললেন:'হাঁ, তোমাদের চিন্তা বিশ্বাস যদি এরূপই হয়ে থাকে, তাহলে আগামী দিন যে পরিস্থিতি আমাদের সম্মুখে আসতে পারে সে ব্যাপারেও তোমাদেরকে অবহিত করা প্রয়োজন বোধ করছি, আর তা হচ্ছে এই যে, হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউই আগামী দিন বেচে থাকবে না।'

দশই মহররম ইমাম হোসাইন(আঃ) তাঁর সংগীদেরকে এমন এক সম্মানে ভূষিত করেছেন যা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সে দিন ইমাম জয়নুল আবেদীন ব্যতীত আর কোন পুরুষই জীবিত ছিলেন না। ইমাম জয়নুল আবেদীন অসুস্থ অবস্থায় তাবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। অন্য দিকে মজলুম ইমাম শত্রুসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তার চতুর্দিকে তার সংগীদের লাশ এলো পাথারি পড়ে রয়েছিল। এই সময় তিনি যে, বাক্যটি উচ্চারণ করেন তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে:ভূ পৃষ্ঠে ছড়িয়ে থাকা এই লাশ গুলো ব্যতীত আমি আর কাউকে জীবিত বলে মনে করিনা। প্রকৃত পক্ষে এদেরকেই আমি জীবিত বলে মনে করি। আর বাহ্যতঃ যারা জীবিত রয়েছে, প্রকৃত পক্ষে তারা মৃত।

مردہ دلانند بہ روئی زمین بہتر بامردہ شوم ہمنشین

ইমাম হোসাইন যখন তাকে সহায়তা করার জন্যে আওয়াজ বুলন্দ করেন তখন এই বাহ্যতঃ জীবিত এবং প্রকৃত পক্ষে মৃত লোকদের নিকট থেকে সাহায্য কামনা করেন নি। বরং জমিনের উপর

বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে থাকা লাশ গুলোকে, যে গুলো প্রকৃত পক্ষে জীবিত, সম্বোধন করে বলেছিলেন :

«يا أبطال الصفا ويافرسان الهيجاء قوموا عن نومتكم بني الكرام، وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام».

'হে, আমার পবিত্র আত্মা বীরগণ! হে, শৌর্য বীর্যের অধিকারী বাহাদুরগণ! হে, শরীফ ও সদবংশজাত সন্তানেরা, তোমাদের এই গভীর নিদ্রা থেকে উঠো! উঠো এবং এই সব বোদাদ্রোহী দুরাচার লোকদের হামলা থেকে রাসূলের ইজ্জত ও সম্মানের প্রতিরক্ষা করো।'

কিন্তু এরপরে ইমাম নিজেই তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন : না, না, তোমরা শুয়ে থাকো এবং আরামে নিদ্রা যাও। কেননা, আমি জানি যে, তোমাদের পবিত্র দেহ সমূহ তোমাদের শির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

পাদটীকা

১)অসায়েলে শিয়া(وسائل الشيعة), একাদশ খন্ড, পৃঃ ১২৪।

২)নাহজুল বালাগা : হযরত আলী(আঃ), পৃঃ ৫৩৩, বৈরুত সংস্করণ।

৩)এ কথা সত্য যে, বর্তমান যুগে ব্যায়াম চর্চা ও শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরণের আধ্যাত্মিক চেতনা ও অনুভূতি খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। অতীত যুগের বীর পুরুষগণ হযরত আলী(আঃ)কে শৌর্য বীর্য ও শক্তির প্রতীক হিসেবে গণ্য করতেন। কেননা, হযরত আলী(আঃ) উভয় ময়দানেই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন--রণক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় এবং নিজের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার মোকাবিলায়।

وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟ طالب مرد چنین کو بکو

'অর্থাৎ এমন ব্যক্তি কে আছে যে ক্রোধ ও ভোগ লালসার সময় সে তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম। প্রতিটি সড়ক ও অলি গলিতে আমি এধরনের লোকেরই সন্ধানে রয়েছি।'

এ জন্যেই অতীতে বীরত্বের বাহ্যিক প্রকাশ মূলতঃ আধ্যাত্মিক শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। যিনি প্রকৃত বীর পুরুষ ছিলেন তিনি কখনো প্রবৃত্তির বন্ধনে আবদ্ধ হন নি। যিনি সত্যিকারের বীর ছিলেন, তার দৃষ্টি যদি কখনো কোন বে মাহরাম মহিলার প্রতি পড়ে যেতো তৎক্ষণাৎ তিনি তার দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতেন। কারো ইজ্জত বা সতীত্ব নষ্ট করার মানসে তিনি কখনো কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন না। তার বীরত্বপূর্ণ অন্তর কখনো তাকে এ অনুমতি দিত না যে, তিনি কোন বে মাহরাম মহিলার প্রতি তাকান, ব্যাভিচারে লিপ্ত হন, শরাব পান করেন, মিথ্যা কথা বলেন, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেন এবং কারো তোষামোদ করেন।

কেননা, এ গুলো হচ্ছে প্রকৃত বীরত্বের পরিপন্থী। বীর তওয়ার লক্ষণ এ নয় যে, তিনি শক্তি পরীক্ষায় কাউকে পরাস্ত করতে সক্ষম। সক্ষম কোন ভারী বস্তু উত্তোলন করতে। বরং তিনি 'নাফসে আম্মারা'কে স্বীয় বশে আনতে পেরেছেন কিনা, তাই বড় কথা--এটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৪)ইয়াল ইয়াল বদরের নিকটবর্তী একটি উপত্যকার নাম। কথিত আছে যে, আমর ইবনে আবদে উদ যখন তার সংগীদের সহ এই উপত্যকায় পৌঁছে, তখন বনু বকর গোত্রের একদল অশ্বারোহী তাদের মুকাবিলা করে। এ সময় আমর ইবনে আবদে উদ তার সংগীদেরকে এ স্থান ত্যাগ করতে বলে এবং তারা চলে যায়। আর সে একাই সেখানে অবস্থান করে এবং তাদের প্রতিহত করে। এ ঘটনা থেকেই সে এই নামে পরিচিত। (তাফসীর আল মীযান:১৬শখন্ড:পৃ:২৯৭)

৫)কবি বলেছেন : او خدو انداخت بر روی علـــی
افتخار هر نبـــي وهـــر ولـــی

অর্থাৎ সে হযরত আলী(অ:)এর মুখমন্ডলে থুথু নিক্ষেপ করলো--যিনি হলেন প্রত্যেক নবী ও অলির গৌরবে ধন।

৬)বদরের যুদ্ধ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ(সঃ)এর বক্তব্যের জবাবে সাদ ইবনে মুয়াজের উক্তি :আস সিরাতুন্নবুবী--ইবনে হিশাম:২য় খন্ড: পৃ:২৬৭(বৈরুত সংস্করণ)।

৭)যুদ্ধের ইতিহাস সংএশনু বিভিন্ন গ্রন্থে হয়েছে যে, নামাজের সময় উপস্থিত হলে সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ হানাফী এবং আরো কিছু সংখ্যক সংগী ইমাম হোসাইনের সম্মুখে ঢালের ন্যায় দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে নামাজ পড়ার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং এই ভাবেই ইমাম নামাজ আদায় করেছিলেন।

৮)এই উমরের পিতা সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস একজন বিখ্যাত তীরান্দাজ ছিলেন। আরবে তার বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং তিনি অনেক

ইসলামী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৯) একদিন হযরত ইমাম জাফর সাদেক(আঃ) তার এক সাহাবীর ঘরে গেলেন--যে নেহায়েতই ছোট্ট এবং নিম্ন মানের ঘরে বসবাস করছিলো। তার স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েরা অত্যন্ত কষ্টেই সে ঘরে জীবন যাপন করতো অথচ লোকটি ছিল একান্তই সচ্ছল। তার খাওয়া পরার কোনই সমস্যা ছিলনা। অথচ ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে :

ان من سعادة المرء سعة داره،

অর্থাৎ একটি প্রশস্ত ঘরই হচ্ছে মানুষের মংগল ও সৌভাগ্যের সহায়ক। যদি কোন লোক একটি প্রশস্ত ও খোলা মেলা ঘরের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে তা না করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের উপর জুলুম করছে। ইমাম জাফর সাদেক(আঃ) জানতেন যে, এ ব্যক্তি একটি বড় বা প্রশস্ত ঘর তৈরী করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু সে ইচ্ছাকৃত ভাবেই তা করেনি। তাই তিনি বললেন: 'তুমি এধরনের ঘরে কেন বসবাস করছো? যখন তোমার এ সংগতি রয়েছে যে, তুমি একটি প্রশস্ত ঘর তৈরী করতে পারো তখন এ সংকীর্ণ ও অপ্রশস্ত ঘরে স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদেরকে বন্দী করে রাখার কি যুক্তি আছে?' সে বললো : হে, ইমাম! এটা আমার পৈতৃক ঘর সুতরাং আমার অন্তর চায়না যে, এ স্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাই।'

অতঃপর ইমাম বললেন: যদি তোমার পিতা ও পিতামহ এতোটা সচেতন না থেকে থাকে, তাহলে তাদের সে অসচেতনতার ক্ষতিপূরণ তুমি কেন আদায় করছো? সত্বর তোমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নেও। একটি প্রশস্ত ঘরে বসবাস করো। --আমি এখানে জন্ম গ্রহন করেছি, আমার বাপ দাদা এখানে জন্ম গ্রহন করেছেন, আমি এখানেই লালিত পালিত হয়েছি--এরূপ চিন্তা সম্পূর্ণ ভুল।

১০) وسعة শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রশস্ততা। অর্থাৎ তোমরা দেখতে পাবে যে, আল্লাহতায়ালার এই পৃথিবীর বিশাল বিস্তৃত এবং এর মধ্যে কোন সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা নেই। مراغم শব্দটি رغام শব্দ থেকে উদ্ভূত। আর এ থেকেই আরবীতে ارغام انف কথাটি বলা হয়ে থাকে—যার অর্থ হচ্ছে নাককে মাটিতে স্পর্শ করা। আর নামাজে এইরূপ ارغام انف অর্থাৎ নাককে মাটিতে স্পর্শ করাকে মুস্তাহাব বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, মানুষকে তার মাথা সিজদার সময় মাটিতে অথবা এমন কোন জিনিসের উপর রাখা কর্তব্য যা মাটি সংজ্ঞাত আর এটাকেই মুস্তাহাব বলা হয়ে থাকে।

--------0--------